সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

(تحریک اسلامی کی آئندہ لائحہ عمل)

ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশনা বিভাগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

প্রকাশক : আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর - ১৯৬৩

২০তম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৫, বৈশাখ ১৪৩২, শাওয়াল ১৪৪৬

নির্ধারিত মূল্য : ৬৫.০০ (পয়ষট্টি) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে : আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

পেশ কালাম

ভারত বিভাগের পরবর্তী পর্যায়ে বিভাগোত্তর পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলন শুরু করে। পাক গণ-পরিষদে আদর্শ প্রস্তাব পাস হওয়ার পরে ১৯৫১ সনে করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতের নিখিল পাকিস্তান আরকান সম্মেলনে দেশের সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমতে জামায়াত ভাওয়ালপুর, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের জমিদারী প্রথা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে চরম গোত্রীয় বা বেরাদরী সিস্টেমের অক্টোপাসে আবদ্ধ পাকিস্তানী সমাজে নিছক আদর্শের আহ্বানে ভোট হাছিল করা যে কত কঠিন তা পাকিস্তানের বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যারা ওয়াকেফহাল তারা সকলেই জানেন। এতদসত্ত্বেও জামায়াত তার প্রার্থীদের মধ্য হতে ভাওয়ালপুরে দুইজন, পাঞ্জাবে একজন প্রার্থীকে কামিয়াব করতে সক্ষম হয়। যেহেতু অধিকাংশ সিটে জামায়াত প্রার্থীরা পরাজয় বরণ করেন, ফলে জামায়াতের কতিপয় কেন্দ্রীয় শূরার সদস্যদের মনে এই মনোভাব তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে, জামায়াতের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ভুল হয়েছে। রাজনৈতিক প্রোগ্রামকে স্থগিত রেখে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের অর্থাৎ জামায়াতের প্রথম ৩ দফা কর্মসূচীর মধ্যে বর্তমান জামায়াতের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। অর্থাৎ জামায়াতের গৃহীত এতদিনকার প্রোগ্রামের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করে তার কিছু অংশ বাদ দেয়া দরকার। এসব নেতৃবৃন্দের সংখ্যা নগণ্য হলেও এরা শূরার কাজে বেশ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর বিভাগের মাছিগোট নামক পল্লীতে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর এক সদস্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ১৯৫৭ সনের এ রুকন সম্মেলনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান হতে মোট ১৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) জামায়াতের অতীত কার্যাবলী ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে একটি বিশদ প্রস্তাবনা পেশ করেন। অতঃপর তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা ব্যাপী দুই কিস্তিতে এক দীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন, যাতে করে জামায়াত সদস্যগণ পূর্ণ দূরদৃষ্টি সহকারে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। প্রস্তাবনার সঙ্গে যারা ভিন্নমত পোষণ করতেন তাদেরকেও আপন প্রস্তাবনা পেশ ও তার অনুকূলে বক্তব্য রাখার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়। তিন দিন ব্যাপী বিচার-বিবেচনা এবং প্রতিটি মতামতের উপরে বিস্তৃত আলোচনার পর ৯২০ (নয়শত বিশ) জন সদস্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর প্রস্তাবনার পক্ষে এবং মাত্র পনেরো জন সদস্য বিপক্ষে ভোট দান করেন। এভাবেই শতকরা ৯৮ ভাগেরও বেশী সংখ্যক ভোটে প্রস্তাবনাটি গৃহীত হয়। এই বইটি সেই মূল প্রস্তাবনা এবং প্রস্তাবনার উপরে প্রদত্ত বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ।

আশা করি যারা জামায়াত এবং জামায়াতের কর্মধারাকে সম্যকরূপে বুঝতে চান এ পুস্তকখানা তাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। বিশেষ করে জামায়াতের সদস্য, কর্মী ও সমর্থকগণ এ পুস্তক পাঠে খুবই উপকৃত হবেন বলে আশা পোষণ করি।

— আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

সূচীপত্র

মূল প্রস্তাবনা ৭
প্রস্তাবনার উপরে বক্তব্য ১০
প্রস্তাবনার দশটি বুনিয়াদী ধারা ১১
প্রথম ধারা ১২
জামায়াতে ইসলামীর মূল লক্ষ্য কি ছিলো ১৪
লক্ষ্য অর্জনের উপায় ১৬
জামায়াতের গঠনতন্ত্রে মূল লক্ষ্যের ব্যাখ্যা ১৮
জামায়াতের ঘোষণাপত্রে মূল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা ১৯
সাধারণ সভা-সম্মেলনে মূল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা ২০
যে নীতিসমূহ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ২৯
দ্বিতীয় ধারা ৩০
১৯৫১ সালের চার দফা কর্মসূচী ৩১
কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৩৪
তৃতীয় ধারা ৩৭
চতুর্থ ধারা ৩৮
প্রোগ্রামের ব্যাখ্যা ৩৮
চিন্তা ও জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে কাজের প্রোগ্রাম ৩৯
জামায়াতের সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ সংশোধনের কাজ ৪০
জনগণের সংশোধন ও ট্রেনিং-এর প্রোগ্রাম ৪২
পঞ্চম ধারা ৪৫
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে জামায়াতের রাজনৈতিক কাজ ৪৫
জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের আসল লক্ষ্যবস্তু কি ছিলো ৪৬
আন্দোলনের ক্রমিক পর্যায়সমূহ ৪৭
প্রথম পর্যায় ৪৮
দ্বিতীয় পর্যায় ৪৯
তৃতীয় পর্যায় ৫৩
চতুর্থ পর্যায় ৫৭
একটি ভুল ধারণার নিরসন ৬২
১৯৪৭ সালের বিপ্লব ৬৬
ষষ্ঠ ধারা ৬৮
দেশ ভাগকালে অবস্থার পরিবর্তন এবং তার দাবী ৬৮
প্রদেশসমূহের বিভক্তিকরণ ও লোক বিনিময় ৬৯
সাবেক ধর্মহীন শাসনতন্ত্রের অস্থায়ী মর্যাদা লাভ ৭১

জাতীয় জীবনের শূন্যতা ৭৩
ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ৭৪
মুসলিম জাতির অঙ্গ হিসাবে আমাদের কর্তব্য ৭৫
নয়া ফাসেক নেতৃত্বের বিপদাশংকা ৭৬
গোটা উপমহাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ ৭৭
দেশ-বিভাগকালে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থা ৭৯
কর্মপন্থার পরিবর্তন এবং তার স্বরূপ ৮১
ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী একটি প্রচণ্ড আঘাত ৮৪
শাসনতন্ত্রের দাবী সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ভুল ধারণা ৮৫
সমাজের উপর আমাদের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব ৯৩
সপ্তম ধারা ৯৬
স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের মতবাদ ৯৭
কর্মসূচীর রাজনৈতিক অংশ নিষ্ক্রিয় করার পদ্ধতি ৯৮
রাজনৈতিক অংশকে নিষ্ক্রিয় করার কারণ ও প্রমাণগুলো পর্যালোচনা ১০০
অষ্টম ধারা ১১৬
ভারসাম্যের গুরুত্ব ১১৬
ভারসাম্যহীনতার দাবী কর্মসূচী পরিবর্তনের দলীল নয় ১১৭
ভারসাম্যের প্রশ্নে এক বিরাট ভ্রান্ত ধারণা ১১৮
নবম ও দশম ধারা ১২০
নেতৃত্ব পরিবর্তনের একমাত্র পথ নির্বাচন ১২০
প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করা দরকার ১২০
মতানৈক্যের কারণ ও তার দুর্বলতা ১২১
ভ্রান্ত ধারণা ১২২
সমাজের ভাঙা-গড়ার সাথে নির্বাচনের সম্পর্ক ১২২
নির্বাচন শুধু সমাজ-সংশোধনের মাধ্যমই নয়, তার মানদণ্ডও ১২৪
নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফল ১২৪
মতানৈক্যের আরো কতিপয় কারণ ১২৮
নৈতিক দেউলিয়াপনার আশংকা ১২৯
ব্যর্থতার আশংকা ১৩২
মাত্র কয়েকটি আসন লাভ ১৩৪
‘প্রত্যক্ষ’ ও ‘পরোক্ষ’ পদ্ধতি ১৩৭
ব্যাপকতর কর্মনীতির প্রয়োজন ১৩৯
শেষ কথা ১৪০

মূল প্রস্তাবনা

আজ থেকে পনেরো বছর[১] আগে যে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং যে মূলনীতিসমূহ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে জামায়াতে ইসলামী তার যাত্রা শুরু করেছিলো, আজ পর্যন্ত সে সেইসব মূলনীতি অনুসরণ করে সেই মন্‌জিলে মকছুদের দিকেই এগিয়ে চলছে– এজন্যে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী আল্লাহ্ তায়ালার শোক্‌রিয়া আদায় করছে। এই দীর্ঘ এবং কঠিন সফরকালে যদি তার দ্বারা দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো খেদমত হয়ে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণতঃ আল্লাহ্ তায়ালারই করুণামাত্র এবং এজন্যেও সে আপন প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। আর যদি তার দ্বারা কোনো অক্ষমতা ও ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তা নিজেরই অন্যায়ের ফল এবং এজন্যে সে আপন প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্যে দোয়া করছে।

জামায়াতে ইসলামী এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ১৯৫১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াত সদস্যদের সাধারণ সম্মেলনে আমীরে জামায়াত, মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে যে কর্মসূচী পেশ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ এবং সঠিক ভারসাম্য সহকারে আন্দোলনের উদ্দেশ্য– তার সমস্ত আদর্শিক ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করছে এবং ভবিষ্যতেও তাই এ আন্দোলনের কর্মসূচী থাকা উচিত।

উক্ত কর্মসূচীর প্রথম তিনটি অংশ (অর্থাৎ চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন, সৎ ব্যক্তিদের সন্ধান, সংগঠন ও ট্রেনিং দান এবং সামাজিক সংশোধনের প্রচেষ্টা) তো জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের প্রথম দিন থেকেই তার কর্মসূচীতে আবশ্যিক অংশ হিসাবে শামিল রয়েছে। অবশ্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জামায়াতের উপায়-উপকরণ অনুসারে ঐগুলো কার্যকরী করার পন্থা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। ঐ অংশগুলো সম্পর্কে জামায়াত বর্তমানে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, ভবিষ্যতে অন্য কোনো জামায়াতী ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত ঐ তিনটি অংশকে এই প্রস্তাবনার সাথে পরিশিষ্ট হিসাবে (জামায়াতের প্রথম ৩ দফা কর্মসূচীর আলোকে প্রণীত) সংযোজিত প্রোগ্রাম অনুসারে কার্যকরী করতে হবে। পরন্তু জামায়াতের এই সাধারণ সম্মেলন মজলিসে শুরা এবং সমস্ত আঞ্চলিক

---

১. এ প্রস্তাব গ্রহণের সময় (১৯৫৭) জামায়াতের বয়স ছিলো পনের বছর।

حلقه জেলাওয়ারী ও স্থানীয় জামায়াতকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তারা যেনো ঐ প্রোগ্রামের উপর এতোখানি গুরুত্ব প্রদান করে, যাতে করে কর্মসূচীর চতুর্থ অংশের সাথে জামায়াতের গোটা কার্যাবলীর সুষ্ঠু ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং তা স্থাপিত থাকে।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংশোধন সম্পর্কিত এই কর্মসূচীর চতুর্থ অংশটিও প্রকৃতপক্ষে শুরু থেকেই জামায়াতের বুনিয়াদী উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল রয়েছে। জামায়াত এ প্রশ্নটিকে হামেশাই জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত প্রশ্ন বলে বিবেচনা করেছে যে, জীবন ব্যবস্থার চাবিকাঠি কি সৎলোকের হাতে ন্যস্ত, না ফাসেক লোকদের হাতে? দুনিয়ার জীবনে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মর্যাদায় কি খোদার অনুগত লোকেরা অভিষিক্ত না তার আনুগত্য-বিমুখ লোকেরা? বস্তুতঃ শুরু থেকেই জামায়াতের এই দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে যে, যে পর্যন্ত ক্ষমতার চাবিকাঠির উপর দ্বীন-ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হবে, সে পর্যন্ত দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আদৌ পূর্ণ হতে পারে না। পরন্তু এ নিগূঢ় সত্যকেও জামায়াত শুরু থেকেই সামনে রেখেছে যে, দ্বীন-ইসলামের এই প্রাধান্য কখনো রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং এ হচ্ছে একটি ক্রমিক কাজ যা লা-দ্বীনী জীবন ব্যবস্থার মোকাবেলায় দ্বীনী ব্যবস্থাকামীদের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ধাপে ধাপে অগ্রগতির মাধ্যমেই পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। এই উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী ভারত-বিভাগের পূর্বে কার্যতঃ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে থাকলে তার প্রধান কারণ ছিলো সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের অভাব। পরন্তু তখনকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এ উদ্দেশ্যে কাজ করার পথে শরয়ী' বিধি-নিষেধও ছিলো একটি অন্যতম কারণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন আল্লাহ তায়ালা সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ উভয়েরই ব্যবস্থা করে দিলেন এবং শরয়ী' বিধি-নিষেধও দূরীভূত হবার সম্ভাবনা দেখা গেলো, তখন জামায়াত তার কর্মসূচীর ভিতর এই চতুর্থ অংশটিও– যা তার মূল উদ্দেশ্যের এক অপরিহার্য দাবী ছিলো– শামিল করে নিলো। এ ক্ষেত্রে দশ বছরের চেষ্টা-সাধনার পর এখন লা-দ্বীনী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমর্থক শক্তিগুলোর মোকাবেলায় দ্বীনী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমর্থকদের অগ্রগতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দেশের শাসনতন্ত্রেও[১] দ্বীনী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বুনিয়াদী নীতিসমূহ সন্নিবেশিত করানো হয়েছে। এখন ঐ সন্নিবেশিত নীতিসমূহ দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় কার্যতঃ

---

১. ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র

চালু করা নেতৃত্বের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ে একটি সৎ-নেতৃত্বকে ক্ষমতাসীন করার সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, এই কর্মসূচীর চারটি অংশেই ভারসাম্যের সাথে এমনিভাবে কাজ করে যেতে হবে, যাতে করে প্রত্যেক অংশের কাজই অপর অংশের জন্যে পরিপূরক ও প্রেরণাদায়ক হয় এবং প্রথম তিন অংশে যে পরিমাণ কাজ হবে সেই অনুপাতে দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় দ্বীনী ব্যবস্থাপনার সমর্থকদের প্রভাব ও অনুপ্রবেশও কার্যতঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু একথা স্পষ্টতঃ মনে রাখতে হবে যে, ভারসাম্য বজায় না থাকাকে কোনো অবস্থায়ই এই কর্মসূচীর কোনো অংশকে নাকচ, নিষ্ক্রিয় বা মুলতবী করার দলীল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

উপরন্তু জামায়াতে ইসলামী তার গঠনতন্ত্র অনুসারে যাবতীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্যে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়ই কাজ করতে বাধ্য। আর পাকিস্তানে এই সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্যে একটিমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পথই খোলা রয়েছে, তা হচ্ছে নির্বাচনের পথ। এ জন্যেই জামায়াতে ইসলামী দেশের নির্বাচনের সাথে একেবারে সম্পর্কহীন থাকতে পারে না– তাতে সে প্রত্যক্ষভাবে হোক, কি পরোক্ষভাবে অথবা উভয় পন্থায়ই অংশগ্রহণ করুক না কেন। এখন নির্বাচনে ঐ তিন পন্থার মধ্যে কখন কোন্ পন্থায় অংশগ্রহণ করা হবে, বাকী থাকলো শুধু এই প্রশ্ন। একে জামায়াত তার মজলিসে শূরার উপর ছেড়ে দিচ্ছে, যাতে করে প্রত্যেক নির্বাচনকালে সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করে মজলিস এ ব্যাপারে কোনো ফায়সালা করতে পারে।

প্রস্তাবনার উপরে বক্তব্য

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে এটি প্রথম ঘটনা যে, আমাদের এই আন্দোলনকে যে কর্মধারার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাকে আজ আমরা একটি প্রস্তাবনার আকারে বিশ্লেষণ করছি। এর আগে গত পনেরো বছর যাবত এই নিয়ম চলে আসছে যে, বিভিন্ন সভা-সম্মেলন উপলক্ষে আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, কর্মনীতি ও কার্যসূচী বিশ্লেষণ করতেন এবং সেই বক্তৃতাই জামায়াতের স্থায়ী পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আন্দোলনের জন্যে পথনির্দেশের কাজ করতো। আজ সেই পুরানো নিয়মের ব্যতিক্রম করে এই বিষয়টিকে একটি প্রস্তাবনার আকারে পেশ করার এবং এ সম্পর্কে বিকল্প প্রস্তাব ও সংশোধনী উত্থাপনের সুযোগ দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, জামায়াত যে পূর্ণ দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে তার নীতি (policy) ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং তার সামনে যতো সম্ভাব্য পথ পেশ করা হবে, তা উত্তমরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে একটিমাত্র পথ অবলম্বন করতে পারে।

এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ প্রস্তাবনা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে আমাকে অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ একটি বক্তৃতা প্রদান করতে হচ্ছে। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কেবল এই নয় যে, এর ফলে জামায়াতের সদস্যগণ প্রস্তাবনার সকল দিক খুব ভালোমতো বিবেচনা করে এ ব্যাপারে পূর্ণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে একটি ফায়সালা করতে পারবেন। বরং এর প্রয়োজন এজন্যেও অনুভূত হয়েছে যে, বর্তমান সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশীসংখ্যক সদস্য মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোতে আমাদের সহযাত্রী হয়েছেন এবং সেহেতু এই আন্দোলনের ক্রমবিকাশটা তাদের পুরোপুরি জানা নেই। তাই এ পর্যন্ত আমরা কোন্ কোন্ পর্যায অতিক্রম করে এসেছি, প্রত্যেক পর্যায়ে কি কি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, সেসব অবস্থায় আমরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এবং কেন করেছি, বর্তমানে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে সামনে এগুতে হলে কিভাবে আমাদের পথ বেছে নিতে হবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে, এগুলো তাদের বিশদভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাবনায় দশটি বুনিয়াদী ধারা

এই উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রস্তাবনার মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করার আগে আমি এর ভিতর সন্নিবেশিত ধারাসমূহকে আলাদা আলাদা করে দেখাতে এবং প্রত্যেকটি ধারাকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করে তার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে ও অন্যান্য ধারার সংগে তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে চাই।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবনা দশটি ধারা সমন্বিত ঃ

প্রথম ঃ যে মহান উদ্দেশ্যে এই জামায়াত গঠিত হয়েছিলো এবং যে মূলনীতিগুলো সে মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করেছিলো, আজ পর্যন্ত সে সেই লক্ষ্যপথেই, সেই সব মূলনীতি মেনে নিয়েই এগিয়ে চলছে।

দ্বিতীয় ঃ ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত করাচী সম্মেলনে এই আন্দোলনের জন্যে যে কর্মসূচী পেশ করা হয়েছিলো, তা পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যাবতীয় আদর্শিক ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করছে। সুতরাং ভবিষ্যতেও তা-ই এ আন্দোলনের কর্মসূচী থাকা উচিত।

তৃতীয় ঃ কর্মসূচীর প্রথম তিনটি অংশ কোনো নতুন জিনিস নয়, বরং আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই তা এর কর্মসূচীর আবশ্যিক অংশ হিসাবে রয়েছে।

চতুর্থ ঃ এই প্রস্তাবনার সংগে যে প্রোগ্রাম পেশ করা হচ্ছে, আপাততঃ ঐ অংশত্রয়ের বাস্তবায়নের জন্যে তাই যথেষ্ট এবং উপযোগী।

পঞ্চম ঃ এই কর্মসূচীর চতুর্থ অংশটিও শুরু থেকেই জামায়াতের বুনিয়াদী উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তা মহান লক্ষ্যের অনিবার্য দাবী ছিলো। তবে দেশ ভাগের আগে শুধু সময়-সুযোগ ও উপায়-উপরণের অভাবে এবং শরয়ী' নিষেধাজ্ঞার কারণেই কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ষষ্ঠ ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যেমন সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি শরয়ী' নিষেধাজ্ঞাও দূরীভূত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই জামায়াত ঠিক উপযুক্ত সময়েই তার বাস্তব প্রোগ্রামের মধ্যে ঐ অংশটিকে শামিল করে নিয়েছে।

সপ্তম ঃ দশ বছর যাবত চেষ্টা-সাধনার পর যে ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে তা এই কর্মসূচীর কোনো রদ-বদলের প্রয়োজন নির্দেশ করে না, বরং তা শুধু চারটি অংশে সঠিক ভারসাম্য সহকারে, সমানভাবে কাজ করারই দাবী জানায়।

অষ্টম ঃ এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করার ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু ভারসাম্যহীনতাকে কখনো এর কোনো অংশকে বাতিল, নিষ্ক্রিয় বা মুলতবী করার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

নবম ঃ নির্বাচনের সাথে আমরা আদৌ সম্পর্কহীন থাকতে পারি না– তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করি অথবা পরোক্ষভাবে কিংবা উভয় পদ্ধতিতে।

দশম ঃ উল্লিখিত তিন পদ্ধতির মধ্যে আমরা কোন্ পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব জামায়াতের মজলিসে শূরার উপর ন্যস্ত করা উচিত।

এবার এক একটি ধারা সম্পর্কে আমি আলোচনা করবো।

প্রথম ধারা

এই প্রস্তাবনায় সর্বপ্রথম জামায়াতের গত পনেরো বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়েছে যে, তামাম সম্ভাব্য ভুল-ত্রুটি ও অক্ষমতা সত্ত্বেও (যা মানবীয় কাজ-কর্মে স্বভাবতই থেকে যায়) প্রথম দিন থেকে জামায়াতের সামনে যে মহান উদ্দেশ্য বর্তমান রয়েছে সেই উদ্দেশ্যের পথেই সে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে এবং যে মূলনীতিগুলো মেনে চলার কথা জামায়াত হামেশা ঘোষণা করে আসছে সেই নীতির উপরই সে আজ পর্যন্ত অবিচল রয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রস্তাবনার সূচনা এমনিভাবে কেন করা হলো? এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। তার প্রথম কারণটি তো প্রস্তাবনার ভাষায়ই প্রকাশ পেয়েছে। তা হলো এই যে, এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক নৈতিক অধঃপতন ও চিন্তার বিভ্রান্তির মধ্যে কাজ করা এবং পনেরোটি বছর পর্যন্ত ক্রমাগত পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা সত্ত্বেও আমরা আপন লক্ষ্যপথে অবিচল রয়েছি এবং বাস্তব আচরণ দ্বারা নিজেদেরকে একটি আদর্শবাদী জামায়াতরূপে প্রমাণ করতে পেরেছি; এজন্যে সামনে অগ্রসর হবার আগে এই বিশেষ অনুগ্রহের নিমিত্তে আমাদের আল্লাহ্ তায়ালার শোক্‌রিয়া আদায় করা উচিত। বস্তুতঃ এ কথার ভিতর

আমাদের এতটুকু ফখর বা অহমিকাবোধ নেই, বরং নেয়ামতের স্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং শোক্‌রিয়া আদায় করা কর্তব্য বলেই আমরা একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। তাছাড়া আল্লাহ্ তায়ালা যাতে আমাদেরকে অধিকতর হেদায়াত ও তাওফিক দানে ধন্য করেন, এ কামনাও একথার অন্যতম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, একটি সক্রিয় ও কর্মতৎপর জামায়াতের কর্মধারা ও সংগঠনের মধ্যে কি কি সংশোধনযোগ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, তা যেমন তাকে হামেশা লক্ষ্য রাখতে হয়, তেমনি সে যে সত্যি সত্যি তার লক্ষ্যস্থলের দিকেই এগিয়ে চলছে এবং নিজস্ব নিয়ম-নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, এ ব্যাপারেও তার নিশ্চিন্ততার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে তার মনে যদি কোনো সন্দেহ থেকে যায় এবং দশ-পনেরো বছর যাবত পথচলার পর হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে সে ভুল পথে চালিত হয়েছে কি-না বলে ভাবতে শুরু করে, তবে তা এক নিতান্ত নিরুৎসাহজনক ও অস্থিরতাব্যঞ্জক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে যা তার কর্মশক্তিকে করবে নিস্তেজ এবং সামগ্রিক বিচারবোধ ও চরিত্রের উপর থেকে তার আস্থাকে করে দেবে টলটলায়মান। এরপর সে নিশ্চিত মনে সামনের দিকে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করতে সাহস পাবে না। কারণ আপন লক্ষ্যস্থল এবং সেদিকে অগ্রসর হবার সঠিক পথ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা আছে কিনা এবং এ ব্যাপারে তার নিজস্ব নিয়ম-নীতির উপর অবিচল থাকবার শক্তি আছে কিনা– এ সম্পর্কে তার নিজের উপরই কোনো ভরসা থাকবে না।

আপনারা আমার বক্তব্য উপলব্ধি করতে ভুল করবেন না। আমরা ভুল পথে চললেও উৎসাহ ও কর্ম প্রেরণা বজায় রাখার জন্যে নিজেদেরকে নির্ভুল মনে করতে থাকবো, এটা আমার বক্তব্য নয় বরং আমার বক্তব্য হচ্ছে ঃ আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল এবং তারই অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে এগিয়ে চলছি কিনা, সেগুলোকে সামনে রেখে তাও বিচার করে দেখতে হবে। সেই সঙ্গে একটি জামায়াত হিসাবে আমরা আমাদের বিঘোষিত নীতিসমূহ সঠিকভাবে মেনে চলছি কিনা, সেগুলোকে সামনে রেখে তাও বিচার করে দেখতে হবে। অতঃপর স্বাধীন বিচার বিবেচনায় যদি আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এই সকল দিক দিয়ে আমাদের নীতি ও কার্যক্রম ভ্রান্ত নয়, তবে আল্লাহ্ তায়ালার শোক্‌রিয়া আদায় করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং এরপর মনের ভেতর কোনো সন্দেহেরই অবকাশ রাখা উচিত

নয়। ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কাজ; কিন্তু নির্ভুলকে অযথা ভুল মনে করা কিংবা যে কোন ছিদ্রান্বেষীর অংগুলি-সংকেতেই সন্দেহে লিপ্ত হওয়া কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয়। আমরা যদি আপন উদ্দেশ্য ও কর্মধারা অনুধাবন ও যাচাই-পরীক্ষা করার মতো বোধশক্তিই হারিয়ে ফেলি কিংবা যে কোনো ছিদ্রান্বেষীর অংগুলি-সংকেতেই নতমস্তক হয়ে ত্রুটি স্বীকার করার মতো নৈতিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হই (তা ছিদ্রান্বেষণকারী তার বোধশক্তিহীনতার কারণেই নির্ভুলকে ভুল বলে অভিহিত করুক না কেন) কেবল তখনই আমাদের পক্ষে উল্লিখিতরূপ নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত হওয়া সম্ভব।

জামায়াতে ইসলামীর মূল লক্ষ্য কি ছিলো?

এবার দেখা যাক, আমরা যে কাজের জন্যে সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম, তার মূল উদ্দেশ্য কি ছিলো? আজ থেকে পনেরো বছর আগে জামায়াতে ইসলামী গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো, তার পটভূমি ছিলো এই ঃ তখন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যে আন্দোলন ও দলগুলো কাজ করছিলো, তারা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি, নতুবা তাকে উপলব্ধি করা এবং নিজেদের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও এমন সব পথে তারা অগ্রসর হচ্ছিলো, যা কিছুতেই সে লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম ছিলো না। ১৯৩৯ থেকে ৪১ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত ও পর্যায়ক্রমে লিখিত প্রবন্ধাবলীতে এই ভ্রান্তিকেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে তোলা হয় এবং পরে তাই مسلمان اور موجوده سیاسی کشمکش তৃতীয় খণ্ড নামে প্রকাশিত হয়। সেই সংগে ইসলামের মূল লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার সঠিক পথ কি উক্ত প্রবন্ধাবলীতে তা-ও স্পষ্টভাবে বলা হয়। এমনকি উক্ত প্রবন্ধাবলীতে সেই মূল লক্ষ্যে উপনীত হবার এবং তার নিজস্ব পথে কাজ করার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে কতিপয় ব্যক্তিকে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল গঠনের জন্যে সংঘবদ্ধ করে। কাজেই এই জামায়াতের গঠন-উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে হলে এর জন্মের আসল প্রেরণাদানকারী ঐ প্রবন্ধাবলীর দিকেই সর্বপ্রথম আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। উক্ত প্রবন্ধে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে ইসলামের মূল লক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

"তিনিই আপন রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন। যেনো তাকে সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন– এ কাজ মুশ্‌রেকদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন।"

অতঃপর এইভাবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয় ঃ

'হেদায়েতের (الهدى) অর্থ হচ্ছে দুনিয়ায় জীবন যাপন করার সঠিক পদ্ধতি। অর্থাৎ ব্যক্তিগত আচরণ, পারিবারিক ব্যবস্থা, সমাজ-পদ্ধতি, অর্থনৈতিক কাজ-কারবার, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনৈতিক কর্ম-কৌশল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ– এক কথায় জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে মানুষের সঠিক কর্মনীতি কি হওয়া উচিত।'

'সত্য দ্বীন (دين حق) হচ্ছে এই যে, মানুষ অন্য মানুষের, আপন নফ্‌সের এবং তামাম সৃষ্টির বন্দেগী ও আনুগত্য ত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার সর্বময় ক্ষমতাকে মেনে নিবে এবং তাঁরই বন্দেগী ও আনুগত্য কবুল করবে।'

সমগ্র দ্বীনের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যতো রকমের আনুগত্য করছে, তা সবই বৃহত্তর দ্বীনের শাখা-প্রশাখা মাত্র। পুত্র কর্তৃক পিতার আনুগত্য করা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর আনুগত্য করা, চাকর কর্তৃক মনিবের আনুগত্য করা, নিম্ন কর্মচারী কর্তৃক উর্ধতন অফিসারদের আনুগত্য করা, প্রজা কর্তৃক গভর্নমেন্টের আনুগত্য করা, শিষ্য-অনুগামী কর্তৃক নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করা এবং এ ধরনের অন্যান্য বেশুমার আনুগত্য মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। (এই আয়াতে যাকে আদ্দীন বা সমগ্র দ্বীন বলা হয়েছে)।

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রাসূল আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, এই গোটা আনুগত্যের ব্যবস্থাকে তামাম শাখা-প্রশাখা সমেত একটি বৃহৎ আনুগত্য এবং একটি বিরাট কানুনের অধীন হতে হবে। অর্থৎ তামাম আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অধীন করে দিতে হবে, খোদায়ী কানুনই হবে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। এই বৃহৎ আনুগত্য এবং আইন ব্যবস্থার পরিধির বাইরে কোনো আনুগত্যেরই অস্তিত্ব থাকতে পারবে না।

'যারা ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক জীবনে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথে অন্যান্য বেনিয়াজ (অর্থাৎ খোদার আনুগত্য থেকে মুক্ত) আনুগত্যকে শরীক করে, এমন প্রতিটি লোকই শের্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত। এমন লোকদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁর মিশন পূর্ণ করে যাবেন, তাঁর উপর এই কর্তব্যই ন্যস্ত করা হয়েছে

লক্ষ্য অর্জনের উপায়

এই লক্ষ্যবস্তুকে পেশ করেই জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের আহ্বান জানানো হয়েছিলো। আর এই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার যে পন্থা বাতলানো হয়েছিলো, তা ছিল এই ঃ 'এই লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হবার সঠিক পথ হচ্ছে তাই, যা আল্লাহ্র রাসূল অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ লোকদেরকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনের দিকে আহবান জানাতে হবে। অতঃপর যারা এই দাওয়াতকে কবুল করে নিজের বন্দেগী ও আনুগত্যকে আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিবে, আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে অন্যান্য আনুগত্যকে শরীক করা থেকে বিরত থাকবে এবং খোদার কানুনকে নিজের জীবনের কানুনে পরিণত করবে, তাদের সমন্বয়ে একটি মজবুত দল গঠন করতে হবে। অতঃপর এই দলটি তার সম্ভাব্য সকল নৈতিক, শিক্ষামূলক ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের সাহায্যে সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে বৃহত্তর জিহাদ চালিয়ে যাবে, যতোক্ষণ না আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য আনুগত্যের পৃষ্ঠপোষক শক্তিগুলোর মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং সমগ্র আনুগত্য-ব্যবস্থার উপর হেদায়াত ও সত্য দ্বীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।'

এই কর্মপন্থার প্রতিটি অংশই ভেবে দেখবার মতো। প্রথম অংশ হচ্ছে এই যে, মানুষকে সাধারণভাবে আল্লাহ্ তায়ালার সার্মভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা মেনে নেবার এবং তাঁর প্রেরিত কানুনকে নিজের জীবন বিধানে পরিণত করার আহ্বান জানাতে হবে। এই দাওয়াত সর্বসাধারণের জন্যে হামেশা তৎপর থাকা এবং এর সংগে অন্যান্য অপ্রাসংগিক বিষয় মিশ্রিত না হওয়া উচিত। বিভিন্ন জাতি, বংশ এবং দেশের পারস্পরিক ঝগড়া, নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিতর্ক, খোদাহীন ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটিকে অপরটির চাইতে অগ্রাধিকার দান, কিংবা এমন কোন বিপর্যয়মূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করা, অথবা এমন কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিজের সুবিধা করে নেবার চেষ্টা করা ইত্যাদি শুধু যে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনের সংগে অসংগতিপূর্ণ তাই নয়, বরং এগুলো স্পষ্টতঃ তার পরিপন্থী এবং তার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। কাজেই কোনো ব্যক্তি বা দল যখন সত্যের দাওয়াতের জন্যে কাজ করবে, তখন তার পক্ষে এই জাতীয় তামাম ঝগড়া ও বিতর্ক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকা এবং নিজেদের দাওয়াতের সংগে অন্য কোনো অপ্রাসংগিক ও বেখাপ্পা বিতর্কে জড়িত না করাই উচিত।

দ্বিতীয় অংশ এই যে, যারা এই দাওয়াতকে বুঝে-শুনে কবুল করবে, যারা বন্দেগী ও আনুগত্যকে যথার্থভাবে আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিবে, যারা আল্লাহ্র আনুগত্যের সংগে অন্যান্য আনুগত্যকে শরীক করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ্র বিধানকেই নিজেদের বাস্তব জীবন-বিধান হিসাবে গ্রহণ করবে, কেবল এমন লোকদের নিয়েই দল গঠন করতে হবে। পক্ষান্তরে যারা এই চিন্তা-পদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থাকে শুধু মুখে স্বীকার করবে কিংবা এর প্রতি নিছক সহানুভূতি পোষণ করবে, তারা এ সংগ্রামী দলের নেতা তো দূরের কথা, সদস্য পর্যন্ত হতে পারে না। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ আন্দোলনের প্রতি যে যতোখানি সহানুভূতিসম্পন্ন বা পৃষ্ঠপোষক হবে, তাকেই গনীমত মনে করতে হবে। কিন্তু সদস্য এবং সহানুভূতিশীলের মধ্যে যে প্রকৃত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তাকে কোনো অবস্থায়ই উপেক্ষা করা উচিত নয়।

তৃতীয় অংশ এই যে, খোদাহীন আনুগত্য ব্যবস্থার উপর সরাসরি হামলা চালাতে হবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কায়েম করাকেই সমস্ত প্রয়াস-প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে। এছাড়া অপর কোনো উদ্দেশ্যেই শক্তির অপচয় করা যাবে না।[১] এই কর্মপন্থার ভিত্তিতেই ইসলামী লক্ষ্যের জন্যে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছিলো। আর শেষ পর্যন্ত সেই আহ্বানেই এ জামায়াতটি জন্মলাভ করে। مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش - তৃতীয় খন্ডের শেষদিকে জামায়াতের যে গঠনতন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভূমিকাটি আপনারা দেখুন।

তাতে বলা হয়েছেঃ 'ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে, জীবনের বিপর্যয়মূলক ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়া। আর এই সামগ্রিক ও বুনিয়াদী পরিবর্তন কেবল আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত পথেই সম্ভব। কিন্তু এ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যা কিছু হয়ে আসছে এবং এখনো যা হচ্ছে, তা যেমন এই উদ্দেশ্যে নয়, তেমনি তা এই কর্মপন্থায়ও নয়। কাজেই বর্তমানে এমন একটি জামায়াতের প্রয়োজন, যা সঠিক অর্থে ইসলামী জামায়াত হবে এবং ইসলামী লক্ষ্যের জন্যে, ইসলামী পন্থায়ই কাজ করবে। এই কারণেই যারা সঠিক ইসলামী নীতির ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহশীল, ১৩২০ হিজরীর শা'বান মাসে (১৯৪১ ঈসায়ীর আগষ্ট) তাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করা হয় এবং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে 'জামায়াতে ইসলামী'র ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

---

১. তৃতীয় খণ্ড مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش বিষয়বস্তু اسلام کی راہراست اور اس سے انحراف کی راہیں -

জামায়াতের গঠনতন্ত্রে মূল লক্ষ্যের ব্যাখ্যা

জামায়াত গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সম্মেলনেই যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়, তাতে ঘোষণা করা হয় ঃ 'দুনিয়ায় হুকুমাতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠা এবং আখেরাতে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে জামায়াতের মূল লক্ষ্য এবং তার সমস্ত প্রয়াস-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। অতঃপর হুকুমাতে ইলাহিয়ার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয় যে, এর অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট হুকুমাত নয়, বরং তার শরয়ী হুকুমাত। অর্থাৎ মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তমদ্দুন, কৃষ্টি, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে রাসুলদের মারফত যে আইন-কানুন এসেছে, তারই ভিত্তিতে গড়া হুকুমাত। সেই সংগে মুমিনদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, খোদার সৃষ্ট বিধান যেরূপ তামাম বিশ্বজাহানে কার্যকরী রয়েছে, তেমনি তাঁর শরয়ী বিধানকেও মানব সমাজে প্রবর্তন করতে হবে।' পরন্তু একথাও তাতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় যে, একাজ প্রকৃতপক্ষে তবলীগ, নছিহত, সদুপদেশ ও সতর্কবাণীর দ্বারাই করতে হয়, কিন্তু যারা অবৈধভাবে খোদার রাজ্যের মালিক হয়ে বসে, সাধারণতঃ তারা শুধু ওয়াজ-নছিহত শুনেই আপন প্রভুত্বের দাবী থেকে বিরত হতে চায় না; এ কারণেই হুকুমাতে ইলাহিয়ার পথ থেকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অপসারণ করার জন্যে মুমিনদেরকে সংগ্রাম করতে হয়।'[১]

এই গঠনতন্ত্র এগারো বছর পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র হিসাবে চালু ছিলো। অতঃপর ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী তার নিজস্ব গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে। সেই গঠনতন্ত্রের চার নং ধারায়ও এই মূল লক্ষ্যই নিম্নোক্ত ভাষায় বিবৃত হয় ঃ

'কার্যতঃ দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ হুকুমাতে ইলাহিয়া বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা) এবং প্রকৃতপক্ষে খোদার সন্তোষ ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা।'

এবং এর ব্যাখ্যা প্রসংগে সাবেক গঠনতন্ত্রের বিষয়বস্তুই এমনিভাবে পুনরুল্লেখ করা হয় ঃ

দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা বলতে দ্বীনের কোনো বিশেষ অংশের প্রতিষ্ঠা বুঝায় না, বরং এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণ দ্বীনের প্রতিষ্ঠা– তার সম্পর্ক ব্যক্তিগত জীবনের সংগে হোক অথবা সামাজিক জীবনের সংগে, নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাতের সংগে হোক

১. জামায়াতে ইসলামীর প্রথম গঠনতন্ত্র, ধারা-২, ব্যাখ্যা সমেত

অথবা অর্থনীতি, রাজনীতি, তমদ্দুন ও সামাজিকতার সংগে । বস্তুতঃ ইসলামের কোন অংশই অপ্রয়োজনীয় নয়, বরং সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক ইসলামই প্রয়োজনীয়। একজন মু'মিনের কাজ হচ্ছে, কোনো প্রকার ভাগাভাগি না করেই এই পূর্ণাংগ ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যে অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা-সাধনা করা। এর যে অংশ ব্যক্তির আপন সত্তার সংগে সম্পৃক্ত, তাকে নিজের জীবনে ব্যক্তিগতভাবে রূপায়িত করাই প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। আর যে অংশের প্রতিষ্ঠা সমষ্টিগত প্রয়াস-প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়, তার জন্যে ঈমানদার লোকদের দলীয় (জামায়াতী) সংগঠন ও চেষ্টা-সাধনা করা আবশ্যক।

'মুমিনের প্রকৃত জীবন-লক্ষ্য যদিও খোদার সন্তোষ ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা; কিন্তু দুনিয়ায় খোদার দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনা ছাড়া এই উদ্দেশ্য কিছুতেই হাসিল হতে পারে না।

এজন্যেই মু'মিনের কার্যতঃ লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা, আর প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে খোদার সন্তোষ লাভ– যা অর্জিত হবে দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বাস্তব প্রচেষ্টার দ্বারা।'

জামায়াতের ঘোষণাপত্রে মূল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা

গঠনতন্ত্রের পর একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবিজ হচ্ছে তার ঘোষণাপত্র (Manifesto)। ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন[১] উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে, তার প্রথম পৃষ্ঠায়ই জামায়াতের গঠন-উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত ভাষায় পেশ করা হয় ঃ

এই জামায়াত প্রচলিত অর্থে কোনো সংকীর্ণ রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সংস্কারবাদী দল নয়, বরং ব্যাপক অর্থে এ একটি আদর্শবাদী দল; এ জামায়াত গোটা মানব জীবনের জন্য একটি ব্যাপকতর জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী এবং নিজের সেই জীবন দর্শনকে মানুষের চিন্তাধারায়, আকীদা-বিশ্বাসে, নৈতিক-চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্য ও শিল্পে, তাহজিব ও তমদ্দুনে, ধর্ম ও সামাজিকতায়, অর্থনৈতিক কায়-কারবারে, রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধে রূপায়িত করতে চায়। এই জামায়াতের দৃষ্টিতে খোদার আনুগত্য-বিমুখতা, আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের নেতৃত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনই হচ্ছে দুনিয়াব্যাপী বিপর্যয়ের মূল কারণ।

১. তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ

এই জামায়াতের দৃষ্টিতে মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের একটি মাত্র পথ রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, মানব-জীবনের গোটা ব্যবস্থাপনাকে তার সমগ্র শাখা-প্রশাখা সমেত এক খোদার বন্দেগী ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ বন্দেগী ও আনুগত্যের জন্যে আম্বিয়ায়ে কেরামের নেতৃত্বকেই একমাত্র সনদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যার বিশুদ্ধ ও পূর্ণাংগ রূপ কেবল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার ভিতরেই সুরক্ষিত রয়েছে এবং ব্যক্তি চরিত্র থেকে শুরু করে জাতির সামগ্রিক কর্মপদ্ধতি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসকেই সেই নৈতিক মূল্যবোধের উপর দাঁড় করাতে হবে, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আখেরাতে জবাবদিহি সম্পর্কিত অনুভূতির উপর।

সাধারণ সভা-সম্মেলনে মূল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা

গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের পর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সনদ হচ্ছে জামায়াত সদস্যদের সাধারণ সভা-সম্মেলনে প্রদত্ত ব্যাখ্যা– তা কোনো জামায়াতী প্রস্তাবাকারে হোক অথবা আমীরের বক্তৃতাকারে। কেননা এমনি ধরনের উপলক্ষে আমীরে জামায়াত যা কিছু বলেন, তা কারো ব্যক্তিগত অভিমত বলে বিবেচিত হয় না, বরং গোটা জামায়াত তাকে গৃহীত সনদের মর্যাদা দিয়ে থাকে। আমি এখানে জামায়াতের রোয়েদাদ (কার্য বিবরণী) থেকে বিভিন্ন সময়কার সভা-সম্মেলনে প্রদত্ত মূল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যাসমূহ পেশ করছি।

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম সম্মেলন– যাতে জামায়াতের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। সেখানে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য এইভাবে বিবৃত করা হয় যে, 'দ্বীনকে একটি আন্দোলনরূপে জারি করতে হবে।' এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয় যে, 'আমাদের জীবনে দ্বীনদারী শুধু ব্যক্তিগত আচরণ হিসাবে জড়বস্তু হয়ে থাকতে পারবে না বরং আমাদের সংঘবদ্ধভাবে দ্বীনী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করতে এবং এর পথ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোকে অপসারণ করার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে।' আরো সামনে এগিয়ে এই প্রসংগেই বলা হয় ঃ

'একথা জামায়াতে যোগদানকারী প্রতিটি ব্যক্তিরই ভালো মতো বুঝে নেয়া দরকার যে, এ জামায়াতের সামনে যে করণীয় কাজ রয়েছে তা কোন হালকা বা সহজ কাজ নয়। একে দুনিয়ার গোটা জীবন ব্যবস্থা– তার নৈতিকতা, রাজনীতি, তমদ্দুন, অর্থনীতি, সামাজিকতা, এক কথায় প্রত্যেকটি জিনিসই বদলে ফেলতে

হবে। খোদার প্রতি অনাস্থার ভিত্তিতে যেসব জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোকে পরিবর্তিত করে খোদার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এ কাজে তামাম শয়তানি শক্তির সংগেই রয়েছে তার যুদ্ধ।'

১৯৪৫ সালে 'দারুল ইসলামে' (পাঠানকোট, পূর্ব পাঞ্জাব) অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'ইসলামী দাওয়াত ও তার কর্মনীতি' সম্পর্কে এক বিস্তৃত বক্তৃতা প্রদান করা হয়। তাতে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য বিবৃত করে বলা হয় ঃ

নিছক একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করাই আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং গোটা মানব জীবনে– তার ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক দিকে ইসলামের নির্দেশিত বিপ্লব সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য; এজন্যেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং এরই দাওয়াত প্রচার ও চেষ্টা-সাধনার উদ্দেশ্যে হামেশা আম্বিয়ায়ে কেরামের নেতৃত্বে 'উম্মতে মুসলিমা' নামে একটি দল গড়ে উঠেছে।'

অতঃপর নিম্নোক্ত তিনটি ধারায় এই দাওয়াতের সারমর্ম পেশ করা হয় ঃ

১। আমরা সাধারণভাবে সকল মানুষকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্র বন্দেগী ও দাসত্বের দিকে আহ্বান জানাই।

২। যারাই ইসলাম কবুল করবে অথবা তাকে মেনে চলবার দাবী জানাবে, তাদেরকে নিজ জীবন থেকে মুনাফেকী ও স্ববিরোধিতা দূর করার, মুসলমান বলে পরিচয় দিতে হলে নিজদেরকে সাচ্চা মুসলমানরূপে তৈরী করার এবং ইসলামের রঙে নিজেদেরকে পুরোপুরি রাঙিয়ে তোলার আহ্বান জানাই।

৩। বাতিলপন্থী ও ফাসেক-ফাজেরদের নেতৃত্বে আজ যে জীবন ব্যবস্থা চালিত হচ্ছে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কর্তৃত্বের যে চাবিকাঠি খোদাদ্রোহীদের হাতে চলে গেছে, আমরা তাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আদর্শবাদী মু'মিন ও সৎলোকদের হাতে সোপর্দ করার আহ্বান জানাই।

এরপর উল্লিখিত তিনটি ধারারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। জামায়াতের সর্বপ্রথম কাজ হিসাবে আল্লাহ্র বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানানোর কথা বলা হয়েছে। এ তাৎপর্য নিম্নোক্ত ভাষায় বিবৃত করা হয় ঃ

'খোদাকে পুরোপুরিভাবে ইলাহ্ ও রব্ব, মাবুদ ও শাসক, মনিব ও মালিক, রাহ্নুমা ও আইন-প্রণেতা, হিসাবগ্রহীতা ও প্রতিফলদাতারূপে মানুষ স্বীকার করবে এবং তার গোটা জীবনকে– তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও আদর্শিক জীবনকে ঐ এক

খোদার বন্দেগীর কাছেই ন্যস্ত করবে। খোদার বন্দেগী সম্পর্কিত এধারণার অনিবার্য দাবী এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীদের মারফত আমাদেরকে যে জীবন পদ্ধতি, জীবন বিধান, নৈতিক আদর্শ, তামাদ্দুন, সামাজিকতা, রাজনীতি এবং চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি দান করেছেন, আমাদের জীবনের তামাম কায়-কারবার তারই ভিত্তিতে চালিত করবো এবং এক মুহূর্তের জন্যেও জীবনের কোন ক্ষুদ্রতর বিভাগেও– এই সত্যবিধানের পরিপন্থী অপর কোন বিধানের আধিপত্য বরদাশ্ত করবো না– আমরা যেনো সাচ্চা দিলে এই কামনা করি।'

জামায়াতের দাওয়াতের দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে জীবন থেকে মুনাফেকী দূর করা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয় ঃ

'মুনাফেকী আচরণ বলতে আমরা বুঝাতে চাই সেই আচরণকে, যখন মানুষ একটি দ্বীনের আনুগত্যের দাবী জানিয়ে তার সম্পূর্ণ বরখেলাফ জীবন ব্যবস্থাকে নিজের উপর প্রভাবশীল ও প্রতিষ্ঠিত দেখে সন্তুষ্ট থাকে। সে জীবন ব্যবস্থাকে অপসারিত করে সে নিজের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কোন চেষ্টা-সাধনা করে না, বরং সেই ফাসেকী ও খোদাদ্রোহী জীবন ব্যবস্থাকে নিজের জন্যে অনুকূল করে তোলে এবং তার ভিতর নিজের আরামের জায়গাটি খুঁজে নেবার জন্যে ফিকির করে, অথবা তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করলেও তার উদ্দেশ্য ফাসেকী ব্যবস্থার বদলে সত্য দ্বীনী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা নয়, বরং একটি ফাসেকী ব্যবস্থার পরিবর্তে আর একটি ফাসেকী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। একটি জীবন ব্যবস্থার প্রতি ঈমান রাখা এবং কার্যতঃ ভিন্ন জীবন ব্যবস্থায় তুষ্ট থাকা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। সাচ্চা ঈমানের সর্বপ্রথম দাবী এই যে, মানুষ যে জীবন পদ্ধতির প্রতি ঈমান পোষণ করবে, তাকেই নিজের বাস্তব জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। সাচ্চা ঈমান তার চলার পথে কোনো ক্ষুদ্রতর অন্তরায়কে বরদাশ্ত করতেও প্রস্তুত হতে পারে না, গোটা দ্বীন ইসলামকে অপর কোনো জীবন-ব্যবস্থার অধীনস্থ দেখে তুষ্ট থাকা তো দূরের কথা! কেননা এমনি অবস্থায় কোথাও দ্বীনের কোনো শাখা-প্রশাখা চালু থাকলেও তা শুধু এজন্যেই সম্ভব হতে পারে যে, বিজয়ী জীবন-ব্যবস্থা তাকে অনিষ্টহীন মনে করে হয়তো কৃপাস্বরূপ বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই কৃপাটুকু ছাড়া জীবনের সমগ্র কায়-কারবার দ্বীন ইসলামের পরিবর্তে বিজয়ী ব্যবস্থার ভিত্তিতে চালিত হওয়া সত্ত্বেও সাচ্চা ঈমান তা নিজের জায়গায় শুধু তুষ্ট এবং নিশ্চিন্ত থাকাই নয়, বরং কুফরের এই প্রাধান্যকে সে অপরিবর্তনীয় বিধিলিপি মেনে নিয়েই যাবতীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে, এটা কখনো সম্ভবপর নয়। বস্তুতঃ ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে এ ধরনের ঈমানের যতোই দাম থাকুক না কেন, দ্বীন-ইসলামের দিক দিয়ে এমনি ঈমান আর মুনাফেকীর মধ্যে কোনোই তফাৎ নেই।'

এরপর তৃতীয় ধারা, অর্থাৎ নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রসংগে বলা হয় ঃ 'নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে খোদার বন্দেগীর কাছে সমর্পণ করা এবং এই ব্যাপারে কোনোরূপ মুনাফেকীর প্রশ্রয় না দিয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দেয়া। অতঃপর নিজেদের জীবন থেকে স্ববিরোধিতা ও কর্মবৈসাদৃশ্য দূর করে একনিষ্ঠ মুসলিম হবার চেষ্টা করতে হলে অনিবার্যভাবে আমাদেরকে একটি বিরাট কাজ করতে হবে। তাহলো এই যে, কুফরী ও নাস্তিকতা, ফাসেকী ও ফাজেরী এবং অনৈতিকতার ভিত্তিতে আজ যে জীবন-ব্যবস্থা চালিত হচ্ছে, তাতে আমূল পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই জীবন-ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও নকশা প্রণয়ন করেছেন খোদার প্রতি বিমুখ ও তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘনকারী চিন্তানায়ক ও গবেষকগণ। যতোদিন পর্যন্ত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এই শ্রেণীর লোকদের হাতে থাকবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচার-প্রোপাগান্ডা, আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন, অর্থব্যবস্থা, খাদ্য-কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ ইত্যাদির উপর এদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অব্যাহত থাকবে, ততোদিন কারো পক্ষে দুনিয়ায় খাঁটি মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করা এবং খোদার বন্দেগীকে নিজের জীবন বিধানে পরিণত করা কার্যতঃ শুধু কঠিনই নয়, বরং ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে চিন্তা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে ইসলামের অনুগামী হিসাবে রেখে যাওয়াও এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়বে।

পরন্তু যে ব্যক্তি সঠিক অর্থে খোদার বান্দাহ হবে, তার অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে খোদার সন্তোষ মুতাবেক দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যয়ের (ফাসাদ) কবল থেকে মুক্ত করে কল্যাণের ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করাও একটি প্রধান কর্তব্য হবে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত নেতৃত্ব কর্তৃত্বের চাবিকাঠি সৎলোকদের হাতে না আসবে, ততোক্ষণ এই উদ্দেশ্য কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। ফাসেক-ফাজের এবং খোদাদ্রোহী ও শয়তানের অনুগত লোকেরা দুনিয়ার নেতা, চালক ও ব্যবস্থাপক থাকবে, তবু দুনিয়ায় জুলুম, ফাসাদ, অনৈতিকতা ও গোমরাহীর দৌরাত্ম্য চলবে না– এটা বিবেক-বুদ্ধি ও প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা, বরং অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ব্যাপার।'

অতঃপর নিম্নোক্ত ভাষায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনের উদ্দেশ্য বিবৃত করা হয় ঃ

'দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি কেবল ফাসেক ও ফাজেরদের হাত থেকে মু'মিন ও সৎ লোকদের হাতে ন্যস্ত করাই আমাদের দাওয়াতের লক্ষ্য নয়; বরং কল্যাণকামী ও সংস্কারবাদী লোকদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করাও আমাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য। এই দলটি শুধু পোখতা ঈমান, একনিষ্ঠ ও একরঙ্গা ইসলাম এবং পবিত্র চরিত্রেরই অধিকারী হবে না, সেই সংগে দুনিয়ার জীবন-ব্যবস্থাকে উত্তমরূপে চালিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীতেও ভূষিত হবে। আর শুধু ভূষিত হওয়াই বিরোধী কর্মকর্তা ও কর্মীদের চাইতে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করবে।'

১৯৪৫ সালের ঐ সম্মেলনেই 'ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি' সম্পর্কে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করা হয়। "এটি روداد جماعت তৃতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং আলাদা পুস্তক আকারেও প্রকাশিত হয়েছে।" উক্ত বক্তৃতায় বলা হয়ঃ

'আমাদের এই আন্দোলনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধন; অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আমরা ফাসেক ও ফাজের নেতৃত্বকে খতম করে সৎ লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মহান লক্ষ্যে উপনীত হতে চাই। কেননা এই চেষ্টা-সাধনাকে আমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র উপায় বলে মনে করি। বস্তুতঃ ফাসেক, ফাজের ও খোদাদ্রোহী লোকদের নেতৃত্বই হচ্ছে মানব জাতির তামাম দুঃখ ক্লেশের মূলীভূত কারণ। কাজেই দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের কর্তৃত্ব ও পরিচালন ব্যবস্থা সৎলোকদের হাতে ন্যস্ত করার উপরই মানব জাতির কল্যাণ সর্বতোভাবে নির্ভর করে।

যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধন করতে চায় এবং বিপর্যয়, বিশৃংখলা, অনৈতিকতা ও অনাচারকে বিনাশ করে শান্তি, শৃংখলা, নৈতিকতা ও কল্যাণের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তার পক্ষে শুধু নেকী, খোদাপরস্তী ও নিষ্কলুষ চরিত্রের ওয়াজ-নছিহত ও মৌখিক উপদেশ প্রদানই যথেষ্ট নয়, বরং ফাসেক লোকদের হাত থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নেয়া এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে মানব সমাজে যত সৎ লোক পাওয়া যাবে, তাদেরকে সুসংহত করে একটি সামগ্রিক শক্তির রূপ দেয়াই তার কর্তব্য।'

বস্তুতঃ মানব জাতির কর্তৃত্বের চাবিকাঠি কার হাতে নিবদ্ধ, এই প্রশ্নের উপরই গোটা মানব সমাজের শান্তি, শৃংখলা ও ভাঙন-বিপর্যয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা

নির্ভরশীল। একথা সর্বজনবিদিত যে, ড্রাইভার যেদিকে চালিত করে গাড়ী হামেশা সেদিকেই ছুটতে থাকে। আর গাড়ী যেদিকে চলে তার যাত্রীদেরকেও ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায়– বাধ্য হয়ে সেদিকেই যেতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে মানবীয় তমদ্দুনের তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের চাবিকাঠি যাদের হাতে নিবদ্ধ, তারা যেদিকে চালিত করে, গোটা তমদ্দুনের গাড়ী সেদিকেই চলতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট যে, দুনিয়ার যাবতীয় উপায়-উপকরণ, শক্তি-ক্ষমতা, সাধারণ মানুষের জীবনধারা, চিন্তা ও মতবাদ গঠনের উপকরণ, ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ গঠন এবং নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতা যাদের মুষ্টিবদ্ধ, তাদেরই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীন লোকেরা সমষ্টিগতভাবে তাদেরই নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে কিছুতেই চলতে পারে না। এই সব নেতা ও কর্তৃত্বশালীরা যদি খোদা-পরস্ত ও সৎ লোক হয়, তবে স্বভাবতই সমগ্র ব্যবস্থাপনাই খোদা-পরস্তী ও কল্যাণের ভিত্তিতে চালিত হবে, নেকী ও কল্যাণ সেখানে বিকাশ লাভ করবে, আর অন্যায় ও পাপাচার একেবারে নিশ্চিহ্ন না হলেও তা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের এই ক্ষমতা যদি খোদাবিমুখ ও ফাসেক-ফাজের লোকদের হাতে চলে যায়, তাহলে স্বভাবতই গোটা জীবন-পদ্ধতি খোদাদ্রোহিতা, জুলুম-অনাচার ও অনৈতিকতার ভিত্তিতে চালিত হবে। চিন্তা ও মতবাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি, সভ্যতা ও সামাজিকতা, নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহার, বিচার-ইনছাফ ও আইন-কানুন সব কিছুই বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলবে। অন্যায় ও অনাচার সেখানে ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করবে এবং নেকী ও কল্যাণ সেখানে বেঁচে থাকার মতো আশ্রয় পাবে না। দুনিয়ার আলো-হাওয়া, মাটি পানি, সবাই তাকে ত্যাগ করবে। এমনিতরো ব্যবস্থায় অন্যায় ও অনাচারের পথে চলা খুবই সহজ, কিন্তু নেকী-কল্যাণের পথে চলা দূরের কথা তার উপর টিকে থাকাও এক কঠিন ব্যাপার।

এরপর খোদ এই দেশের ইতিহাসকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করে বলা হয় যে, ইংরেজদের হাতে কর্তৃত্বের চাবিকাঠি চলে যাবার পর মাত্র এক শতকের মধ্যে কিভাবে তারা গোটা দেশের নৈতিক চরিত্র, মানসিকতা, মনস্তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা বদলে ফেলেছে। মানুষের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ-মতবাদ, স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী তারা বদলে দিয়েছে; তাহজীব-তমদ্দুন, নৈতিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক মানদণ্ড, জীবন-ধারা, আচার-পদ্ধতি, সবকিছুই পরিবর্তিত করেছে। মোটকথা, গোটা মানব জীবনে তারা এমনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেছে যে, কোনো একটি জিনিসও তার

প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। পক্ষান্তরে যাদের হাতে কর্তৃত্বের চাবিকাঠি ছিলো না, দিন দিন তারা অসহায়, দুর্বল, পরাধীন ও প্রভাবহীন হয়ে পড়েছে। এমনকি, অতি পূতঃচরিত্র নিষ্কলংক ধর্ম নেতাদের বংশে পর্যন্ত এমন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা খোদার অস্তিত্ব, ওহী ও নবুয়তের সম্ভাবনা এবং পরকালের অনিবার্যতা সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে পড়েছে। এমনকি তারা শুধু নিজেদেরকেই নয়, তাদের স্ত্রী-কন্যাদেরকেও বিজয়ী শাসকদের আদর্শের রঙে রাঙিয়ে তুলেছে।

এই প্রসংগে একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় যে, মানুষকে খোদার আনুগত্যে নিয়োজিত করা এবং অন্যায় ও পাপাচারকে নিশ্চিহ্ন করে ন্যায় ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের উদ্দেশ্য। কিন্তু মানব জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং মানব সমাজের যাবতীয় বিষয়াদির পরিচালন ক্ষমতা যদি কাফের ও পথভ্রষ্ট লোকদের করায়ত্ত হয় আর সত্য দ্বীনের অনুসারীগণ শুধু তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে তাদের দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে 'খোদার স্মরণ' করতে থাকে, তবে দ্বীনের সে উদ্দেশ্য কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। এ জন্যেই দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে প্রধান ও মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে ব্যক্তি এই দ্বীনের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তার দায়িত্ব শুধু নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে যথাসম্ভব ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেই শেষ হয়ে যায় না, বরং ফাসেক ও কাফের লোকদের হাত থেকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে সৎ লোকদের হাতে ন্যস্ত করা এবং সত্য জীবন-ব্যবস্থাপনাকে পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তার সমগ্র চেষ্টা-সাধনাকে কেন্দ্রীভূত করাই হচ্ছে তার ঈমানের স্বাভাবিক দাবী।

১৯৪৭ সালের মে মাসে দারুল-ইসলাম সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় এবং 'জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত' নামে প্রকাশিত পুস্তিকায়ও এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রায় এমনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথেই পেশ করা হয়েছে। তাতে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, বর্তমানে যে সভ্যতার ভিত্তিতে দুনিয়ার আদর্শিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালিত হচ্ছে, তা তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মহীনতা, জাতীয়তা ও গণতন্ত্র। আমাদের গোটা জীবন-ব্যবস্থা এই নীতিগুলোর ভিত্তিতেই চালিত হবে বটে, তবে এর পরিচালন-ক্ষমতাটা শুধু ইংরেজদের পরিবর্তে ভারতবাসী বা মুসলিম জাতির হাতে ন্যস্ত হবে। জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় বরং

জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, আমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাকে এই তিনটি বুনিয়াদ থেকে অপসারিত করে নিম্নোক্ত তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধর্মহীনতার পরিবর্তে খোদার বন্দেগী ও আনুগত্য, ভৌগোলিক জাতীয়তার পরিবর্তে বিশ্ব-মানবতা এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে খোদার সার্বভৌমত্ব ও জনগণের খেলাফত। পরন্তু এই জামায়াত জীবনব্যবস্থা পরিচালনাকারী ক্ষমতাকে অবশ্যই হস্তান্তর করতে চায়, কিন্তু তা পাশ্চাত্য হাতের পরিবর্তে প্রাচ্য হাতে নয় অথবা বিদেশী হাতের বদলে স্বদেশী হাতেও নয়, বরং তা ফাসেক হাতের পরিবর্তে সৎলোকদের হাতে ন্যস্ত করাই তার উদ্দেশ্য। যারা আল্লাহ্ তায়ালাকে মনে-প্রাণে ভয় করে, তাঁর আনুগত্য করে চলে এবং প্রতিটি কাজে তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, এমনি লোকদেরকেই সে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করতে ইচ্ছুক। জামায়াতের এই মূল লক্ষ্য বিবৃত করার পর মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় ঃ

'বর্তমান যুগের ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র তোমাদের দ্বীন ও ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তোমরা যদি এর পরাভব স্বীকার করো তো কুরআনের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা হবে, এর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কাজে অংশগ্রহণ করো তো আপন রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, এর ঝান্ডা উড়াতে অগ্রসর হও তো আপন খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে। যে ইসলামের নামে তোমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দাও, তার প্রাণবস্তুর সংগে এ নাপাক ব্যবস্থার প্রাণবস্তুর, তার বুনিয়াদী নীতির সাথে এর বুনিয়াদী নীতির এবং তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখার সঙ্গে এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখার তীব্র সংঘর্ষ বিদ্যমান। মোটকথা, এই ব্যবস্থার সাথে ইসলাম কোথাও কোন ব্যাপারে আপোস করতে প্রস্তুত নয়। যেখানে এই ব্যবস্থা ক্ষমতায় অভিষিক্ত হবে, সেখানে ইসলাম মৃতপ্রায় হয়ে থাকবে। আর যেখানে ইসলাম ক্ষমতাসীন হবে, সেখানে এই ব্যবস্থার জন্যে এতোটুকু স্থান থাকবে না। কাজেই তোমরা যদি যথার্থই আল্লাহ্র কোরআন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত ইসলামের প্রতি ঈমান এনে থাকো, তবে তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকো না কেন, এই জাতীয়তাবাদী ধর্মহীন গণতন্ত্রের বিরোধিতা করা এবং এর পরিবর্তে খোদা-ভিত্তিক মানবীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। বিশেষতঃ যেখানে একটি জাতি হিসাবে তোমরা ক্ষমতাসীন হবে, সেখানে যদি তোমাদের দ্বারাই ইসলামের প্রকৃত ব্যবস্থার পরিবর্তে এই কাফেরী

ব্যবস্থা চালু হয়, তবে তোমাদের মুসলমানীর প্রতি শত ধিক্কার– যার নামোচ্চারণে তোমরা গর্বিত বটে, কিন্তু তার কাজ করতে অসম্মত।'

এই বক্তৃতার পরিসমাপ্তি ঘটে নিম্নোক্ত ঘোষণার দ্বারা। মনে রাখতে হবে যে, আমীরে জামায়াত সদস্যদের সম্মেলনে একথা ঘোষণা করেন এবং সদস্যগণও একে অনুমোদন করেন ঃ

'এখন এটা প্রায় স্থিরীকৃত যে, দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। এক অংশের কর্তৃত্ব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে ন্যস্ত করা হবে।আর অপর অংশ হবে অমুসলিম সংখ্যাগুরুদের কর্তৃত্বাধীন। প্রথম অংশে আমরা জনমত সংগঠন করে আমাদের নিজস্ব কানূন ও শাসনতন্ত্রের উপর (যাকে আমরা মুসলমানরা খোদায়ী কানুন ও শাসনতন্ত্র বলে বিশ্বাস করি) রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করবো।'

সহকর্মী বন্ধুগণ! জামায়াতে ইসলামীর সামনে প্রথম দিন থেকে যে চূড়ান্ত লক্ষ্য বর্তমান ছিলো এবং বিভিন্ন সময়ে বারবার যার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, এখানে তা পেশ করা হলো। আমি একে জামায়াতের প্রামাণ্য পুস্তকাদি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পুস্তকাদি থেকে এতো বিস্তারিতভাবে এই জন্যে উদ্ধৃত করেছি যে, আপনারা যে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে চেষ্টা-সাধনার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছেন, তার প্রতিটি দিক ও বিভাগ সমেত একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র যেনো আপনাদের সামনে ফুটে উঠে। এখন এই চিত্রকে সামনে রেখে জামায়াতের গত পনেরো বছরের কার্যাবলী যাচাই করা এবং তা' উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোতাবেক সম্পাদিত হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আপনাদেরই কর্তব্য। আমি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে এই মত পোষণ করি যে, জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগতভাবে তার মূল লক্ষ্য সম্পর্কিত সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার প্রতি কখনো উপেক্ষা দেখায়নি। বরং আজ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারেই সে খুব ভেবে-চিন্তে তার নিজস্ব লক্ষ্যপথেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কামনা-বাসনা কি, তা সে স্বচ্ছ মনেই উপলব্ধি করে আসছে এবং পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর অরণ্যের মাঝ দিয়ে তার লক্ষ্য পথ কোন্ দিকে গেছে, তাও সে খোলা চোখেই দেখে আসছে। যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই ভ্রান্তিতে লিপ্ত, যারা অন্ধকারের মধ্যে নিছক আন্দাজ-অনুমানে পথ চলতে শুরু করে এবং চলতে চলতে বার বার থমকে দাঁড়িয়ে ঠিক মতো পথ চলছি কিনা বলে ভাবতে থাকে, জামায়াতের অবস্থা আদৌ তেমন লোকের মতো নয়। সুতরাং পনেরো বছর ধরে এক পথে চলার পর হঠাৎ আমরা ভুল পথে এসে পড়েছি এবং এখান থেকে পিছন ফিরে আবার অন্য

কোন পথে পা বাড়ানো উচিত, এ ধরনের সন্দেহে লিপ্ত হওয়া এ জামায়াতের পক্ষে মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। নিজের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জামায়াত পুরোপুরিই সতর্ক এবং এর প্রতিবিধানের জন্যে চেষ্টা করাকেও সে আপন কর্তব্য বলে মনে করে। কিন্তু কেউ যদি তাকে স্বীকার করাতে চায় যে, সে তার উদ্দেশ্য বুঝতেই ভুল করে ফেলেছে এবং ভুল পথে সে এগিয়ে চলছে, তবে তাকে উপযুক্ত প্রমাণসহ ভুল প্রতিপন্ন করতে হবে এবং কোন্ নির্ভুল পথটি ছেড়ে জামায়াত ভুল পথে এসে পড়ছে, তাও তাকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে।

যে নীতিসমূহ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম

এবার আমরা যে মূলনীতিসমূহ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। এ নিয়ম-নীতিগুলো জামায়াতের পুরনো গঠনতন্ত্রের (১৯৫৭ সালের গঠনতন্ত্র) 'আকীদা, উদ্দেশ্য এবং জামায়াতের সংগঠন' শীর্ষক পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

[আর বর্তমান নয়া গঠনতন্ত্রে[১] এগুলোকে আকীদা, উদ্দেশ্য এবং সদস্য পদের শর্তাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া নয়া গঠনতন্ত্রের ১০ নং ধারায় জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ]

১। কোন বিষয়ের ফায়সালা বা কোন পদক্ষেপ গ্রহণের আগে জামায়াত খোদা এবং রসূলের (সঃ) নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বাকী সব বিষয়কে দ্বিতীয় শ্রেণী হিসাবে ততোটাই গুরুত্ব দেবে, ইসলামে যতোখানি দেবার অবকাশ রয়েছে।

২। নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে জামায়াত কখনো সততা ও বিশ্বস্ততার খেলাফ কিংবা কোন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পন্থা বা উপায় অবলম্বন করবে না।

৩। জামায়াত তার অভীষ্ট সংশোধন ও বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করে যাবে। অর্থাৎ তাবলীগ, সদুপদেশ, প্রচার-প্রপাগাণ্ডা ইত্যাদির মাধ্যমে লোকদের মন-মগজ ও চরিত্রের সংশোধন করা হবে এবং জামায়াতের বাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্য জনমত সংগঠন করা হবে।

---

১. এদ্বারা বুঝানো হচ্ছে ১৯৫২ সালের ২৬শে আগস্ট থেকে ১৯৫৭ সালের মে মাস পর্যন্ত কার্যকরী গঠনতন্ত্র। এরপর ৫৭ সালের ১লা জুন থেকে জামায়াতের তৃতীয় গঠনতন্ত্র চালু হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়টি এতেও হুবহু সন্নিবেশিত হয়।

৪। জামায়াত তার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা-সাধনায় গুপ্ত আন্দোলনের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না, বরং খোলাখুলি ও প্রকাশ্য পন্থা অনুসরণ করবে।

এই নিয়ম-নীতিকে সামনে রেখে গত পনেরো বছরে জামায়াত এর অনুগামী রয়েছে কিনা তা আপনারাই বিচার করে দেখুন। ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে দুনিয়ার কোন প্রতিষ্ঠানই মুক্ত থাকতে পারে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমষ্টিগতভাবে জামায়াতে ইসলামী উল্লিখিত নিয়ম-নীতি পুরোপুরিই পালন করে এসেছে। পরন্তু নীতিহীনতার প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে এদেশে কাজ করা সত্ত্বেও সে ঝড়-তুফান যে তাকে একটি নীতিহীন দলে পরিণত করতে পারেনি এও আল্লাহ্ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। কর্মপন্থা ও পদ্ধতির রদবদল একটা ভিন্ন জিনিস, কোন কোন লোক ভুলক্রমে একে নীতি-বিচ্যুতি বলে আখ্যা দিয়ে বসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীতি ও কর্মপন্থা এক জিনিস নয়। পরন্তু দুনিয়ার কোন প্রতিষ্ঠানই একটি কর্মপন্থাকে চিরকাল আঁকড়ে থাকতে পারে না। বিশেষতঃ যাদেরকে কঠিন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাজ করতে হবে, তারা যদি এক সময় একটি কর্মপন্থাকে সঠিক ও উপযোগী ভেবে গ্রহণ করে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে তা অনুপযোগী ও অকার্যকরী বিবেচিত হয়, তবে অবিলম্বে তাকে বর্জন করে কোন উত্তম এবং অবস্থার দিক দিয়ে অধিকতর উপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে শুধু আবশ্যকই নয়, বিজ্ঞতারও পরিচায়ক। তাছাড়া যতোক্ষণ পর্যন্ত না এটা প্রমাণ করা যাবে যে, আমাদের বিঘোষিত নিয়ম-নীতির চৌহদ্দীর মধ্যে এই ধরনের রদবদল কিংবা আমাদের অনুসৃত কর্মপন্থা অনুপ্রবেশের কোন অবকাশ ছিলো না, ততোক্ষণ এই রদবদলকে কিছুতেই নীতি-বিচ্যুতি বলে আখ্যা দেয়া যাবে না।

দ্বিতীয় ধারা

এবার আমরা দ্বিতীয় ধারার উপর আলোকপাত করবো। এতে বলা হয়েছে যে, ১৯৫১ সালের করাচী সম্মেলনে জামায়াতের যে কর্মসূচী পেশ করা হয়েছিলো, ভবিষ্যতেও তা-ই কর্মসূচী থাকা উচিত। কারণ তা সম্পূর্ণ ও সঠিক ভারসাম্যের সাথে আন্দোলনের তামাম আদর্শিক এবং বাস্তব প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম।

প্রস্তাবনার এই অংশটি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সে কর্মসূচীটি কি ছিলো, তা আপনাদের দেখা দরকার। বস্তুতঃ, ১৯৫১ সালের করাচী সম্মেলনে

সে কর্মসূচীটিকে কোন প্রস্তাবাকারে পেশ করা হয়নি, বরং আমীরে জামায়াত তাকে নিজের বক্তৃতার মাধ্যমে বিবৃত করেছিলেন। পরে তা-ই 'মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যসূচী' নামে এক স্থায়ী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫১ সালের চার দফা কর্মসূচী

উক্ত পুস্তিকার শেষ অংশে এই কর্মসূচীর চারটি অংশ সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। আমি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে পেশ করছি।

১। চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন

প্রথমতঃ আমরা অনৈসলামী প্রতিক্রিয়াশীলতার জংগল সাফ করে আসল ও প্রকৃত ইসলামের সহজ-সরল রাজপথকে উজ্জ্বল করে তুলতে চাই। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাহজীব-তমদ্দুনের মধ্যে কি কি দোষত্রুটি ও বর্জনীয় আর কি কি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য রয়েছে, যাচাই ও সমালোচনার মারফত তা নিরূপণ করা এবং তৃতীয়তঃ বর্তমান যুগের সমস্যা ও বিষয়াদির উপর ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধকে প্রয়োগ করে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের বাস্তব পন্থা নির্দেশ ও তাতে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের বাস্তব চিত্র নির্ণয় করার জন্যে আমরা কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করে আসছি এবং আমাদের এ প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এইভাবে আমরা চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করে বাস্তব জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবার এবং দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্গঠনের জন্যে নানাভাবে চিন্তার খোরাক যোগাবার চেষ্টা করছি।

২। সৎলোকদের সন্ধান, সংগঠন ও ট্রেনিংদান

'আমরা বর্তমান সমাজ থেকে এমন সব নারী-পুরুষকে সন্ধান করছি, যার পুরনো এবং নতুন গোমরাহী থেকে মুক্ত ও পবিত্র হতে ইচ্ছুক, যাদের ভিতর সংশোধনের প্রেরণা বর্তমান এবং যারা সত্যকে সত্য মেনে নিয়ে তার জন্যে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতেও প্রস্তুত। এই শ্রেণীর লোকেরা নব্য শিক্ষিত হোক কিংবা পুরনো, সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হোক কিংবা বিশেষ শ্রেণীর, গরীব হোক কিংবা ধনী, অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর– এরা সমাজের যে স্তরেরই থাকুক না কেন এদেরকে আমরা স্বস্তির পরিবেশ থেকে বের করে এনে কর্ম ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে নামিয়ে দিতে চাই। তারা যদি আমাদের উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও সংগঠন পদ্ধতিকে কবুল

করে নেয়, তবে তাদেরকে আমরা জামায়াতের সদস্যরূপে গ্রহণ করি। আর যদি তারা সদস্য হবার শর্তাবলী পূর্ণ না করে শুধু সমর্থন ও সহায়তা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে তাদেরকে আমরা 'মুত্তাফিক'[১] শ্রেণীভুক্ত হতে আহ্বান জানাই। এইভাবে আমাদের সমাজে যেসব সৎপ্রকৃতির লোক অবশিষ্ট রয়েছে, অথচ যারা বিচ্ছিন্নভাবে থাকার দরুন কিংবা আংশিক সংশোধনের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার ফলে সমাজের কোনই উপকার করতে পারছে না, আমরা তাদেরকে বাছাই করে করে একটি কেন্দ্রস্থলে জমায়েত করতে এবং একটি সুচিন্তিত কর্মসূচী অনুসারে তাদেরকে সংশোধন ও পুনর্গঠনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করতে চাই। আমরা শুধু তাদেরকে এমনি সংগঠনভুক্ত করেই ক্ষান্ত হইনা, বরং এই সংঘবদ্ধ লোকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাতে পরিশুদ্ধ হয় এবং তাদের চরিত্র অধিকতর পবিত্র, মজবুত ও নির্ভরযোগ্য হয়, তজ্জন্য তাদের মানসিক ও নৈতিক ট্রেনিং-এরও আমরা ব্যবস্থা করে থাকি। আমরা শুরু থেকেই এ সত্যটিকে সামনে রেখেছি যে, শুধু কাগজী পরিকল্পনা এবং মৌখিক দাবী-দাওয়ার ফলেই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না। বরং গঠনমূলক কাজের যোগ্যতা এবং সৎ ব্যক্তি চরিত্রের পোষকতার ওপরই এর প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কাগজী পরিকল্পনার ত্রুটি খোদার ফযলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নিরসন করা যেতে পারে; কিন্তু যোগ্যতা ও সততার ভিত্তি ছাড়া কোনো মজবুত ইমারতই গড়ে উঠতে পারে না, আর গড়ে উঠলেও তা টিকে থাকতে সমর্থ নয়।'

৩। সামাজিক সংশোধন ও পুনর্গঠন প্রচেষ্টা

'এর ভিতর অবস্থা অনুযায়ী সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের সংশোধনই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর আমাদের উপায়-উপকরণ যতোটা ব্যাপক হবে এর পরিধিও ততোটাই প্রশস্ত হবে। আমরা আমাদের সদস্য ও মুত্তাফিক কর্মীগণকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেকের যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজের দায়িত্বে ন্যস্ত করি। এদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র আলাদা থাকলেও সবাই একই উদ্দেশ্য এবং একই পরিকল্পনার (Scheme) দিকে জাতির সকল শ্রেণীর লোকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। তাদের সামনে একটিমাত্র লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে, আর তা হচ্ছে পুরনো স্থবিরতা এবং নতুন নিষ্ক্রিয় প্রবণতার কারণে সমগ্র জাতির মধ্যে বিস্তৃত মানসিক, নৈতিক ও কর্মগত

১. বর্তমানে এটাকে 'সহযোগী সদস্য' বলা হয়।

নৈরাজ্যের (Anarchy) অবসান করা এবং সাধারণ থেকে বিশেষ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মধ্যে সাচ্চা মুসলমানের ন্যায় বাস্তব জীবনধারা গড়ে তোলা। সংশোধনের এ বিস্তৃত কর্মসূচীর বুনিয়াদী নীতি হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি যে ক্ষেত্রে বা মহলেই কাজ করুক না কেন, তাকে ক্রমাগত এবং সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং নিজের প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে একটি পরিণতি পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। আমরা কেবল উড়ন্ত পাখি আর ঘূর্ণিবার্তার ন্যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে বীজ ছড়িয়ে যেতে প্রস্তুত নই, বরং আমরা এমন কৃষকের ন্যায় কাজ করতে চাই, যে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে বেছে নিয়ে হাল-চালানো থেকে ফসল কাটার মওসুম অবধি ক্রমাগত কাজ করে নিজের মেহনতকে একটি পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তবে নিঃশ্বাস ফেলে। এর প্রথমোক্ত পন্থায় শুধু জংগল এবং আগাছারই সৃষ্টি হয় আর দ্বিতীয় পন্থায় যথারীতি শস্যক্ষেত্র তৈরী হয়।

৪। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংশোধন

আমরা বিশ্বাস করি যে, সংশোধনের অন্যান্য প্রচেষ্টার সাথে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধনের চেষ্টা করা না হলে জীবনের বর্তমান ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের প্রতিকার করার কোনো প্রচেষ্টাই কামিয়াব হতে পারে না। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-কানুন, শাসন-শৃংখলা এবং রেজেকের বিলি-বন্টনের সাহায্যে যে বিরাট বিপর্যয় প্রভাব বিস্তার করে চলছে, তার মুকাবিলায় শুধু ওয়াজ-নছিহত ও মৌখিক প্রচারে উপদেশ ভিত্তিক সংগঠন প্রচেষ্টা কখনই কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই আমরা যদি যথার্থই নিজ দেশের গোটা জীবন-ব্যবস্থাকে ফাসেকী ও ভ্রষ্টতার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে সত্য দ্বীনের সহজ-সরল পথে চালাতে চাই, তবে শাসন ক্ষমতা থেকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তিকে অপসারিত করে তদস্থলে গঠনমূলক শক্তিকে অভিষিক্ত করার জন্য সরাসরি চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। বস্তুতঃ দেশের শাসন ক্ষমতা কল্যাণ ও সংশোধনকামী লোকদের হাতে ন্যস্ত হলে শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-কানুন ও শাসন-শৃংখলার নীতি পরিবর্তন করে কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এতোটা পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, অরাজনৈতিক পন্থায় যা একশ বছরেও সম্ভবপর হতে পারে না।

এই বিরাট পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব হতে পারে? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এর জন্যে একটিমাত্র পথই খোলা রয়েছে আর তা হচ্ছে, নির্বাচনী প্রয়াস-প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনমতকে ট্রেনিং দেয়া, জনগণের নির্বাচন মানকে

পরিবর্তিত করা এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংশোধন করা। একমাত্র এইভাবেই দেশের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে খালেছ ইসলামী ভিত্তির উপর পুনর্গঠন করতে ইচ্ছুক ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে শাসন ক্ষমতায় আসীন করা যেতে পারে।'

আমরা বিশ্বাস করি, এইভাবে ক্রমাগত কাজ করতে থাকলে এ দেশের জনসাধারণকে কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ট্রেনিং দিতে পারবো। আর জনসাধারণ এই ট্রেনিং-এর প্রভাব কতখানি গ্রহণ করেছে, প্রত্যেক নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যাচাই হতে থাকবে। এইভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন সাধনে হয়তো পঁচিশ বছর কিংবা তার চাইতেও বেশী সময় ব্যয়িত হতে পারে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এটাই হচ্ছে পরিবর্তন তথা বিপ্লব সৃষ্টির সঠিক পথ। এইভাবে যে পরিবর্তন সাধিত হবে, ইন্‌শা-আল্লাহ্ তা সবচাইতে বেশী মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে।

কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

এই হচ্ছে, ১৯৫১ সালের করাচী সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচীর মোটামুটি বিবরণ। এর প্রত্যেকটি অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তখন যা কিছু বলা হয়েছিল, তা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসলে এটি ১৯৫১ সালে গৃহীত কোন নতুন কর্মসূচী নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি আগে থেকেই জামায়াতের কর্মসূচী হিসাবে চলে আসছে। উপরিউক্ত বক্তৃতায় শুধু একে ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করা হয়েছে মাত্র, যাতে করে বছরের পর বছর ধরে জামায়াতে ইসলামী যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে, জামায়াতের কর্মী ও সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলী তা সহজে উপলব্ধি করতে পারে।

আমি এইমাত্র আপনাদের সামনে জামায়াতের যে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলাম, আপনারা তার সঙ্গে কর্মসূচীকে মিলিয়ে দেখলে এক নজরেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এই কর্মসূচী হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যের স্বাভাবিক দাবী এবং এর প্রতিটি অংশই তার প্রতিটি দিক ও বিভাগের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। বস্তুতঃ যে জামায়াতের ঐরূপ উদ্দেশ্য থাকবে, তার কর্মসূচী এমনিই হওয়া উচিত, এছাড়া তার আর কোন কর্মসূচী হতেই পারে না।

পরন্তু এই কর্মসূচীর চারটি অংশের মধ্যেই এক স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। এর একটি অংশ অপর অংশের পোষকতা করে, একটি অপরটি থেকে প্রেরণা লাভ করে। এ কারণে এর কোন একটিকে বর্জন করা

হলে, সমগ্র পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য। বস্তুতঃ জামায়াতের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এই চারটি অংশে যুগপৎ ভারসাম্য সহকারে কাজ করার মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। আপনারা এর যে কোন অংশকেই আলাদা করুন না কেন, তার ফলে বাকী অংশগুলোর কাজ শুধু কমজোর আর প্রভাবহীনই হবে না, বরং সত্যিকারভাবে আপনাদের সমগ্র প্রয়াস-প্রচেষ্টাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

এর প্রথম অংশ ইসলামের খালেছ দাওয়াতকে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে পেশ করে, তাকে গ্রহণ করার জন্যে নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককে তৈরী করে এবং তার কামিয়াবীর জন্যে মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এটা হচ্ছে এ আন্দোলনের সর্বপ্রথম বুনিয়াদী কাজ এ ছাড়া পরবর্তী কোনো কাজের কল্পনাই করা যায় না।

এর দ্বিতীয় অংশ দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে সংঘবদ্ধ করে এবং তাদের সমষ্টিগত শক্তিকে দাওয়াতের প্রসার ও তাকে কামিয়াব করে তোলার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করে। এ অংশটি প্রথম অংশেরই অনিবার্য দাবী। দাওয়াত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনারা দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে সংঘবদ্ধ না করেন, তাদেরকে দাওয়াতের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে প্রস্তুত না করেন এবং কার্যত তাদেরকে কাজে নিয়োজিত না করেন, তবে নিছক দাওয়াত প্রচার একটি অর্থহীন বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এ কাজ তো দাওয়াতকে কামিয়াব করে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় মেশিনারীকেই তৈরী করে। আপনারা যদি লোকদেরকে শুধু আহ্বান জানাতেই থাকেন এবং আহ্বানে সাড়া দানকারীদেরকে সংঘবদ্ধ করে কোনো কাজে না লাগান, তবে সে আহ্বানের অর্থ কি!

এর তৃতীয় অংশ সমাজকে ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্যে বাস্তব ও নৈতিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি এমন কোনো আলাদা কাজ নয় যে, একে এই প্রোগ্রামের মধ্যে শামিল করা বা না করা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে বরং কর্মসূচীর দ্বিতীয় অংশে যে কাজের কথা বিধৃত হয়েছে, এ হচ্ছে তারই ব্যাখ্যা মাত্র। আপনারা দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে সংঘবদ্ধ করে এবং ট্রেনিং দিয়ে সমাজ সংশোধনের কাজেই তো লাগাবেন। সমাজ সংশোধনের কাজ যতোটা করবেন, আপনার দাওয়াত ততোই সম্প্রসারিত হতে থাকবে এবং সংগঠনের জন্যেও আপনারা বেশী সংখ্যক কর্মী পাবেন। আর আপনাদের দাওয়াত ও সংগঠন যতোটা সম্প্রসারিত হবে, সমাজ সংশোধনের পরিধিও ততোটাই বিস্তৃত হবে, সেই সঙ্গে ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্যেও ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকবে। এভাবে এই উভয় অংশ পরস্পরের জন্যে নিতান্ত আবশ্যক ও অপরিহার্য। এর

ভিতর থেকে একটি আপনাদের কর্মসূচীর মধ্যে শামিল হোক আর অপরটি না হোক, এটা আপনারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন না।

এবার চতুর্থ অংশটি দেখুন। এটি চায় যে, যে পরিমাণে আপনাদের দাওয়াত জনপ্রিয় হবে এবং দাওয়াত গ্রহণকারীদের সংগঠন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকবে এবং সেজন্য সমাজও প্রস্তুত হতে থাকবে, ঠিক সেই পরিমাণেই আপনারা ইসলামী জীবন-পদ্ধতিকে কার্যত ক্ষমতাসীন করার এবং জাহেলিয়াতের সমর্থনপুষ্ট শক্তিগুলোকে পিছু হটিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকবেন। আপনারা যদি নিজেদের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কর্মসূচীর প্রথম তিনটি অংশের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তবে এই চতুর্থ অংশটিকে ঐ অংশত্রয়ের এমনি স্বাভাবিক দাবী বলে মনে হবে যে, এটি আপনাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত না হলে ঐ অংশত্রয় সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়বে। আপনারা লোকদেরকে কিসের দিকে আহ্বান জানান? ইসলামী জীবন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠার দিকে নয় কি? এই দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে সংঘবদ্ধ করার এবং তাদেরকে সক্রিয় করে তোলার পিছনে আপনাদের উদ্দেশ্য কি? তারা ইসলামী জীবন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা-সাধনা করবেন, এই নয় কি? সমাজকে আপনারা কি উদ্দেশ্যে তৈরি করেন? ইসলামী জীবন-পদ্ধতির জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছাড়া এর আর কি উদ্দেশ্য রয়েছে? এবার আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন, এই কাজগুলো থেকে অর্জিত ফলাফলকে যদি আপনারা মূল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার জন্যেই ব্যবহার না করেন, তবে আপনাদের এই সমস্ত কাজ করার ফায়দা কি? এই চতুর্থ কাজটির মাধ্যমেই তো আপনাদের আসল উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। এটি যদি আপনাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হয় তো পূর্বোক্ত কাজ তিনটি নিছক পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর এমনি পণ্ডশ্রম করে আপনারা বড়জোর ধর্ম প্রচারকদের (মুবাল্লেগ) একটি দলে পরিণত হতে পারেন, এ দেশে আগেও যার কোন অভাব ছিল না। কিন্তু এই ধরনের প্রচার-উপদেশ আর নৈতিক সংশোধনমূলক প্রচেষ্টার দ্বারা জাহেলিয়াতের সয়লাবকে আগেও কখনো প্রতিরোধ করা যায়নি, আর এখনও করা যেতে পারে না।

এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে ঈপ্সিত ফল লাভের জন্যে জামায়াতে ইসলামীর এই গোটা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিলো, তা কর্মসূচীর এই চারটি অংশেই যুগপৎ কাজ করার দাবী জানায়। সেই ফল লাভ বাস্তবিকই যদি আপনাদের কাম্য হয় তো এই গোটা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই

একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এর অংশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে অথবা এর ভিতর কিছু কম-বেশী করে কিংবা এর কোনোটিকে অগ্রাধিকার দান আর কোনটিকে স্থগিত রেখে আপনারা নিজেদের আন্দোলনের ব্যর্থতা ডেকে আনা ছাড়া আর কোনই ফায়দা হাসিল করতে পারবেন না।

তৃতীয় ধারা

জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচী আগে হয়তো অন্য রকম ছিলো এবং বর্তমান চার দফা প্রোগ্রাম ১৯৫১ সালেই প্রথম গ্রহণ করা হয়েছে, এই ভুল ধারণার নিরসন করেছে প্রস্তাবনার তৃতীয় অংশ। এতে বলা হয়েছে যে, এই প্রোগ্রামের প্রথম তিনটি অংশ তো শুরু থেকেই আমাদের কর্মসূচীর আবশ্যিক অংশ হিসাবে রয়েছে এবং প্রথম দিন থেকে জামায়াত এগুলোর ভিত্তিতে কাজ করে আসছে।

একথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে আমি জামায়াতের একেবারে প্রথম দিককার কার্যবিবরণীর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ১৯৪১ সালে জামায়াত গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সম্মেলনেই আমরা আমাদের কাজের জন্যে যে প্রোগ্রাম করেছিলাম, তা নিম্নরূপ ঃ

একদিকে জামায়াতে যোগদানকারী লোকদের আত্ম-সংশোধন করা এবং অন্যদিকে জামায়াতের বাইরে অবস্থানকারী লোকদেরকে (তারা বংশানুক্রমিক মুসলমান হোক আর অমুসলিম) সাধারণভাবে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব অস্বীকার করার ও খোদার সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার আহ্বান জানানো– দুটোই হচ্ছে জামায়াতের প্রাথমিক প্রোগ্রাম। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই দাওয়াতের পথে কোন শক্তি প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াবে, ততোক্ষণ কারো গায়ে পড়ার তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন কোন শক্তি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, সে যে কোন শক্তিই হোক না কেন– সে শক্তিকে অগ্রাহ্য করেই তার আপন আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার করতে হবে। আর এই প্রচারকার্যে যতো দুঃখ-মুছিবতই আসুক না কেন, পুরুষোচিত সাহসের সাথে তার মুকাবেলা করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়গুলো সম্পর্কে এক্ষুণি কিছু বলা যায় না। পরিস্থিতি যেরূপ দেখা দেবে সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে লোকদের একথা ভালমতো বুঝে নেয়া দরকার যে, এক মজবুত, সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল দ্বীনকে (গায়রুল্লাহ্‌র আনুগত্য ব্যবস্থা) উৎপাটিত করে অন্য একটি দ্বীনকে (খোদায়ী আনুগত্য ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত করা মোটেই সহজ কাজ নয়।[১] উক্ত

১. জামায়াতে ইসলামীর পয়লা গঠনতন্ত্র

সম্মেলনেই জামায়াতের কাজকে চারটি বিভাগে (শিক্ষা, জ্ঞান-গবেষণা, সংগঠন এবং দাওয়াত ও প্রচার) বিভক্ত করে দেয়া হয়। অতঃপর প্রত্যেক বিভাগের উপর যে সকল কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, দশ বছর পর ১৯৫১ সালের কর্মসূচীতেও প্রায় তারই অনুরূপ নকশাই দেখতে পাওয়া যায়।[১] আর এই নকশাই আপনারা মজলিসে শূরার সর্বপ্রথম অধিবেশনে ('৪২ সালের ফেব্রুয়ারী) গৃহীত প্রস্তাবাবলী এবং জামায়াতের অস্থায়ী কেন্দ্রের পরিকল্পনায়ও ('৪২ সালের জুলাই) দেখতে পাবেন।[২] এই জিনিসগুলো দেখে আপনারা খুব ভালোমতোই বুঝতে পারেন যে, জামায়াতে ইসলামী শুরু থেকেই একটি সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। আমাদের উপায়-উপকরণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রও প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে বটে, কিন্তু এ কাজের জন্যে প্রথম দিন থেকেই আমাদের সামনে যে বুনিয়াদী কর্মধারা বর্তমান ছিলো, আজও তাই রয়ে গেছে। এই ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করছি, তা এমনি একটি পরিকল্পনারই দাবী জানায়।

চতুর্থ ধারা

প্রস্তাবনার চতুর্থ অংশে বলা হয়েছে যে, কর্মসূচীর প্রথম তিনটি অংশের জন্যে আপাততঃ এ প্রস্তাবনার সাথে সংযোজিত প্রোগ্রামই যথেষ্ট। অন্য কথায় বলা যায় যে, বর্তমানে যে উপায়-উপকরণ আমাদের হাতে রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিমাণ কাজের আশা করা যেতে পারে, আপাততঃ সেই পরিমাণ কাজের দায়িত্বই আমরা গ্রহণ করেছি। এর অর্থ মোটেই এ নয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের উপায়-উপকরণ বাড়িয়ে দিলেও আমরা শুধু এইটুকু কাজ করেই খুশী থাকবো অথবা বর্তমান উপায়-উপকরণ দ্বারা অধিকতর কোন খেদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হলেও এ প্রোগ্রামে তার উল্লেখ নেই বলে তা থেকে আমরা বিরত থাকবো।

প্রোগ্রামের ব্যাখ্যা ঃ

এবার এই প্রোগ্রামের ভিতর আমাদের কর্মসূচীর জন্যে কি কি জিনিস রাখা হয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে আপনাদের কি করতে হবে, তা আমি বিশ্লেষণ করবো।

---

১. روداد جماعت প্রথম খণ্ড
২. ঐ পৃষ্ঠা ৪১-৫২

চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে কাজের প্রোগ্রাম ঃ

আমাদের কর্মসূচীর পয়লা অংশ হচ্ছে চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন। এটি এমন এক প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র যে, গোটা জামায়াত তার সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত এবং তার উপায়-উপকরণের প্রতিটি অংশ ব্যয় করলেও এর কোন একটি দিকের কাজও সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু তবু আমরা আমাদের সমগ্র শক্তিকে একটি মাত্র ক্ষেত্রেই ব্যয় করতে পারি না, বরং আমাদের মূল লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজই ভারসাম্যের সাথে সম্পাদন করতে হবে। এই জন্যে চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণামূলক কাজের বিভিন্ন দিকের ভিতর থেকে আমরা শুধু জরুরী প্রয়োজনগুলোকে সামনে রেখে ১৯৫৮ সালের শেষ নাগাদ সময়ের জন্যে কাজের একটি পরিকল্পনা তৈরি করছি। এই পরিকল্পনাটি পাঁচটি বড়ো বড়ো বিভাগে বিভক্ত ঃ

১-শিক্ষা বিভাগ

এর মাধ্যমে আমরা তিনটি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। যথা–

(১) আধুনিক যুগের প্রয়োজন মাফিক আলেম তৈরি করার উপযোগী দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষার ইন্তেজাম।

(২) দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা এবং নৈতিক ট্রেনিং উভয়েরই ব্যবস্থা সম্বলিত প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী মক্তব- মাদরাসার প্রতিষ্ঠা।

(৩) বয়স্কদের উপযোগী এমনি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, যার মাধ্যমে অশিক্ষিত লোকদেরকে লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কেও মোটামুটি অবহিত করা হবে এবং নিজের পর্যায়ের অন্যান্য লোকদের সংশোধনের জন্যেও তাদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা যাবে।

২-তরজমা বিভাগ

এর মধ্যে সাবেক কাজগুলোকে অব্যাহত রেখে চারটি বিশেষ কাজের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে ঃ

(১) ইংরেজি ভাষায় জামায়াতের পুস্তকাদির তরজমা।

(২) পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) জরুরী প্রয়োজনীয় কতিপয় পুস্তকের বাংলা তরজমা।

(৩) একটি বাংলা সাময়িকীর প্রকাশনা।

(৪) ইসলাম সম্পর্কে জরুরী কিতাবসমূহ উর্দূ ভাষায় তরজমা করার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম।

৩-আদর্শ প্রচার বিভাগ

এর ভিতর পাঠাগার সম্প্রসারণের প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে।

৪-গবেষণা বিভাগ

এতে উঁচু মানের সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন নওজোয়ানদেরকে জ্ঞান গবেষণার জন্যে তৈরি করার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান যতোদিন পর্যন্ত কায়েম করা সম্ভব না হবে, ততোদিন অন্তত জামায়াতের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদেরকে অন্যান্য সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে বিভিন্ন বিভাগে জ্ঞান-গবেষণার কাজে নিয়োজিত করার এক প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে।

৫-মহিলা বিভাগ

এতে মেয়েদের জন্যে বই-পুস্তক তৈরি করা এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজ আঞ্জাম দেবার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জামায়াতের সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ সংশোধনের কাজ

কর্মসূচীর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে সৎ লোকদের সন্ধান– সংগঠন ও ট্রেনিং দান। এটি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জামায়াতের সম্প্রসারণ ও স্থায়িত্ব বিধানের কাজ। এ কাজটি জামায়াত শুরু থেকেই করে আসছে এবং এরই বদৌলতে আমরা আজ যা কিছু শক্তি অর্জন করতে পেরেছি। বর্তমানে এর জন্যে যে প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে, তা দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

এর প্রথম ভাগ হচ্ছে জামায়াতের সম্প্রসারণ। এতে ১৯৫৮ সালের শেষ নাগাদ জামায়াতের মুত্তাফিক সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে ১০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এটা শুধু জামায়াতের সম্প্রসারণের কাজই নয়, বরং এটা দাওয়াতের সম্প্রসারণ, আদর্শের প্রচার এবং সমাজ সংশোধনেরও কাজ। কারণ, আপনারা যতোক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নিজেদের পয়গাম পৌঁছাবেন এবং হাজার হাজার মানুষকে মুত্তাফিক বানিয়ে জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারবেন, ততোক্ষণ সামাজিক-সংস্কার সাধনের কোন কাজই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যতো লোককে আপনারা মুত্তাফিক বানাবেন, নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে ততোই এ সমাজে ইসলামী দাওয়াতের দ্বারা প্রভাবিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে; আর সবাই না হলেও তাদের ভিতরকার এক বিরাট সংখ্যক লোককে জনকল্যাণ ও সমাজ সংশোধনের কর্মী হিসাবে পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় অংশটি জামায়াতের অভ্যন্তরীণ সংশোধন ও কর্মীদের ট্রেনিং সম্পর্কিত। এতে আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জামায়াতের মধ্যে খারাবী ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণসমূহ নির্ণয় করেছি এবং তার প্রতিকারও বাতলে দিয়েছি। আমাদের মতে জামায়াতের মধ্যে খারাবী সৃষ্টির চারটি বড়ো কারণ রয়েছে ঃ

প্রথম, কর্মীদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হলে যথাসময়ে তার মীমাংসা না করা।

দ্বিতীয়, কোন জায়গা বা এলাকায় কোন কারণে জামায়াতের কাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি হলে অথবা শৈথিল্য দেখা দিলে অবিলম্বে তার প্রতি মনোযোগ না দেয়া।

তৃতীয়, জামায়াত-সদস্যদের নৈতিক ও দ্বীনী অবস্থা, তাদের আচার-ব্যবহার এবং জামায়াতের সংগঠনে তাদের ভূমিকার যথাযথ 'মুহাসিবা' (সমালোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ) না করা, সংশোধনযোগ্য লোকদের সংশোধনের চেষ্টা না করা এবং সংশোধনের অযোগ্য লোকদেরকে জামায়াত থেকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে অযথা গড়িমসি করা।

চতুর্থ, জামায়াতের কর্মীদের ট্রেনিং-এর জন্যে যথোচিত ব্যবস্থা না থাকা এবং যে আকীদা, চিন্তাধারা ও উদ্দীপনা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে কর্মতৎপর রাখার ব্যাপারে প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে, তার প্রতি ক্রমশ অমনোযোগী হওয়া।

আমরা জামায়াতের অভ্যন্তরীণ সংশোধনের জন্যে যে প্রোগ্রাম তৈরী করেছি, তাকে এই চারটি ব্যাধির নিরাময়ের দিকেই কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী কখনো সদস্যসংখ্যার ন্যূনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেনি। তার দৃষ্টি হামেশাই সদস্যদের গুণাবলীর প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে। জামায়াত বিশ্বাস করে যে, অমার্জিত লোকদের এক বিরাট ভীড় জমিয়ে নিলেও তদ্দ্বারা কোন ফলপ্রসূ কাজ হবে না। আমাদের কাছে মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকই থাকুক না কেন, তারা যদি সচ্চরিত্র ও সত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, সংগঠনে মজবুত ও কর্মতৎপর হয় এবং পরস্পরে 'সীসার প্রাচীরে'র ন্যায় একত্রীভূত হয়, তবে তারাই যুগের বন্যার গতিরোধ করতে এবং ঘটনা-প্রবাহকে আপন আকীদা মুতাবেক বদলে দিতে পারবে।

কিন্তু আমাদের দলে শতকরা দু'চার কি দশ-বিশ জন নিষ্ক্রিয় লোক ঢুকে পড়েছে কিংবা এক্ষণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে বলেই যে তাদের মুখ চেয়ে আমরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করবো এবং বসে বসে কর্মসূচী সংশোধন করতে থাকবো, এতে আমরা মোটেই সম্মত নই। আমরা আগেও বহু নিষ্ক্রিয় সঙ্গীকে বাছাই করে বাদ দিয়েছি আর এখনো তাই করবো। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই যে, কাফেলার অগ্রগতিকে তার লক্ষ্যপানে অব্যাহত রাখতেই হবে। যে ব্যক্তি কাফেলার সঙ্গে চলতে পারবে, সে চলবে আর যে পারবে না সে সরে পড়বে কিংবা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। কাফেলার লোকদেরকে সামলানো এবং তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা তো আমরা অবশ্যই করবো কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্যই আমরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করবো না কিংবা আমাদের উদ্দেশ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপ গ্রহণেও বিরত থাকবো না।

জনগণের সংশোধন ও ট্রেনিং-এর প্রোগ্রাম

আমাদের কর্মসূচীর তৃতীয় অংশ হচ্ছে সামগ্রিক সংশোধনের প্রচেষ্টা। জামায়াত তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এ কাজটিও হামেশাই করে এসেছে। এবং আমাদের উপায়-উপকরণ যত বেড়েছে এর ক্ষেত্রও ততোটা প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে। আমাদের বর্তমান শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ দেখে আমরা উপলব্ধি করছি যে, সমাজের ব্যাপকতর সংশোধনের একটি বিস্তৃত প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। কিন্তু আগে থেকে আমাদের স্থায়ী বিভাগগুলোর মাধ্যমে যেসব কাজ হচ্ছে (যেমন জনসেবা, শ্রমিক কল্যাণ বিভাগ ইত্যাদি) এ প্রোগ্রামের ভিতর আমরা তার উল্লেখ করিনি। এর ভিতর নিছক গণ-সংশোধনমূলক কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আগে এ কাজটি কম-বেশী নানা জায়গায় বিভিন্নভাবে হতো। বর্তমানে আমরা জামায়াতী পর্যায়ে এক সুশৃংখল পদ্ধতিতে, এক নিয়মিত অভিযান হিসাবে এবং এক সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে এ কাজটি সম্পাদন করতে চাই এবং যেসব এলাকায় প্রয়োজনীয় কর্মী ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে, সেখানে এক সুশৃংখল ও অনুক্রমিক ধারায় একে এগিয়ে নিতে চাই। এখন থেকে প্রত্যেক এলাকায় জামায়াতকে তার কর্মীদের কাছ থেকে এসব কাজের হিসাব গ্রহণ করা এবং উর্ধতন সংগঠনের কাছে তা প্রেরণ করতে হবে। সেই সঙ্গে কোন্ কোন্ মহল্লায় এ ধরনের কাজ হচ্ছে এবং কি ক্রমিক নীতি ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে তা অন্যান্য মহল্লার দিকে বিস্তৃতি লাভ করছে, তা যেমন তাদের নিজেদের দেখতে হবে, তেমনি উর্ধতন সংগঠনকেও দেখাতে হবে।

আপাততঃ এই প্রোগ্রামের ভিতর আমরা সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের জন্যে কাজের যে নকশা তৈরী করেছি, তা নিম্নরূপ ঃ

১– ধর্মীয় ক্ষেত্রে জামায়াত-কর্মীদের নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে ঃ

(১) জনসাধারণকে খোদা ও রাসূলের আনুগত্যের দিকে আহ্বান জানানো, তাদের ভিতর আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি জাগিয়ে তোলা, তাদেরকে ন্যায় ও পুণ্যের উপদেশ দেয়া এবং ইসলামের তাৎপর্য উপলব্ধি করানো।

(২) মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করার জন্যে যেসব দ্বীনী হুকুম-আহকাম নেহাৎ জরুরী, সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

(৩) মসজিদের দুরবস্থার সংশোধন করা এবং মুসলিম সমাজ মানসে তার জন্যে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের সৃষ্টি করা।

(৪) মাযহাবী ঝগড়া প্রতিরোধ করা এবং লোকদেরকে এ ধরনের ঝগড়ার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

২– নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মীদেরকে তিনটি কাজে শক্তি নিয়োগ করতে হবে ঃ

(১) গুণ্ডামির প্রতিরোধ

(২) অশ্লীলতার মূলোচ্ছেদ

(৩) উৎকোচ ও খেয়ানতের প্রতিরোধ

এই উদ্দেশ্যে আমরা শুধু নৈতিক উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতে চাই না, বরং সমাজের ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে সংঘবদ্ধ করে এর বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থাও অবলম্বন কতে চাই।

৩– সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা তিনটি খেদমত আঞ্জাম দেবার চেষ্টা করবো ঃ

(১) توخذ من اغنيا ءهم فترد على فقراء هم -

(তাদের মধ্যকার ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দাও।) এর শরয়ী' নীতি অনুসারে মহল্লার গরীব, অভাবী ও অক্ষম লোকদের নিয়মিত সাহায্যের ব্যবস্থা এবং তার জন্য সংশ্লিষ্ট মহল্লার সামর্থ্যবান লোকদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা।

(২) সরকারী অফিস ও প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করানো এবং সুবিচার লাভের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের মদদ করা।

(৩) লোকেরা যাতে মিলেমিশে আপন মহল্লার পরিচ্ছন্নতা, রাস্তা-ঘাটের সংস্কার এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, তজ্জন্যে তাদের স্বাবলম্বনের প্রেরণা জাগিয়ে তোলা।

৪– শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করবো ঃ

(১) প্রত্যেক মহল্লায় পাঠাগার স্থাপন করা।

(২) বয়স্কদের জন্যে শিক্ষাকেন্দ্র কায়েম করা।

(৩) যেসব মহল্লার লোকেরা আর্থিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহের জন্যে তৈরি হবে, সেখানে সরকারী পাঠ্য-তালিকার সঙ্গে দ্বীনী শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা সমন্বিত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এই প্রোগ্রামের মধ্যে কর্মসূচীর প্রথমোক্ত তিনটি অংশের যে কোনটির হক্ আদায় করার ব্যাপারে পুরোপুরি চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান উপায়-উপকরণের দৃষ্টিতে এই প্রোগ্রামকে খুব হালকাও বলা চলে না আর খুব ভারীও বলা যায় না। এ জন্যেই প্রস্তাবনায় একে 'যথেষ্ট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমাদের মূল উদ্দেশ্যের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কিংবা সেদিকে অগ্রসর হবার জন্যে অন্য কোন উপায় যদি জরুরী বিবেচিত হয় এবং আমাদের উপায়-উপকরণও তার অনুকূল হয়, তবে এই প্রোগ্রামের সাথে আমরা যে কোন সময় তা সংযোজিত করতে পারবো।

এই বিস্তৃত প্রোগ্রাম দেখে কারো কারো মনে হয়তো এমনি ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, এতো বড়ো লম্বা-চওড়া প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা কঠিন ব্যাপার। এমনিতরো ধারণা কেউ পোষণ করলে তাকে নিতান্তই এক স্থূল ও অগভীর ধারণা বলতে হবে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি রান্নাবান্নার খুঁটিনাটি ও বিস্তৃত বিষয়গুলো বইতে পড়ে কিংবা কারো মুখে শুনেই ঘাবড়ে গেলো এবং ভাবতে লাগলো ঃ এতো কাজ কে করতে পারে! অথচ রান্না যে করে, সে দৈনিক হয়তো দু'তিন বারই এইসব কাজ সমাধা করে থাকে এবং বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখে যেগুলোকে হিজিবিজি বলে মনে হয়, বাস্তব কাজের ভিতর দিয়ে তেমনি অনেক খুঁটিনাটি বিষয়কেই সে আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

পঞ্চম ধারা

এবার প্রস্তাবনার অপর অংশের দিকে আসুন। এতে বলা হয়েছে যে, এই কর্মসূচীর চতুর্থ অংশও (রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংশোধন) কোন নতুন জিনিস নয়, বরং শুরু থেকেই এটি জামায়াতের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য এবং তার মূল লক্ষ্যের অনিবার্য দাবী ছিলো। কিন্তু তার জন্য জামায়াত ভারত বিভাগের পূর্বে কোন বাস্তব পদক্ষেপ– বিভাগোত্তর কালে যেরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে– এই জন্য গ্রহণ করেনি যে, তখন সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ উভয়েরই অভাব ছিলো এবং কতিপয় শরয়ী‘ বিধি-নিষেধও আমাদের পথে অন্তরায় ছিলো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে জামায়াতের রাজনৈতিক কাজ

এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি জামায়াতে ইসলামীর সমস্ত কর্মী এবং এ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির খুব ভালমতো বুঝে নেয়া দরকার। কারণ, এটি না বুঝলে জামায়াতের মূল ভাবধারা, তার তাৎপর্য এবং তার ইতিহাসকে বোঝা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি, এ কারণে ভবিষ্যতে আপন লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবার ব্যাপারে প্রতি পদক্ষেপে মানসিক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ আশংকা আজ এ কারণে আরো বেশী অনুভূত হচ্ছে যে, যারা এ আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোতে আমাদের সঙ্গী হয়েছেন কিংবা ভবিষ্যতে হবেন, তারা স্বভাবতই এ বিষয়টিকে শুধু পুস্তকাদির মাধ্যমেই বুঝবার চেষ্টা করবেন এবং সেহেতু এই পুস্তকগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পর্যায় ও অবস্থানগুলো স্বভাবতই তাদের সামনে থাকবে না। কোন বিশেষ যুগে লিখিত কোন পুস্তক থেকে কারো বিপরীত অর্থ গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বিভ্রান্ত হবার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ একটি আন্দোলনের বই-পুস্তককে সঠিকভাবে বুঝতে হলে, বিভিন্ন পর্যায়ে লিখিত বিষয়বস্তু অধ্যয়নকালে তার সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থাও পাঠকের সামনে থাকা দরকার। এজন্যেই আমি বক্তব্য-বিষয়ের ধৈর্যের পরোয়া না করেই ভারত-বিভাগের পূর্বে আমাদের আন্দোলনকে কোন্ কোন্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাতে সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের কি অভাব ছিল, কি ধরনের শরিয়তী বিধি-নিষেধ আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ঐ অবস্থায় আমরা আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত কোন্ ক্রমিক ধারায়, কোন্ বিশেষ পথে আপন লক্ষ্যপানে অগ্রসর হচ্ছিলাম– আপনাদের সামনে তা সবিস্তারে বিবৃত করবো। অতঃপর প্রস্তাবনার

ষষ্ঠ ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকৃতপক্ষে অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন সূচিত হয়, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে কি নতুন সুযোগ-সুবিধা সামনে আসে, কি নতুন উপায়-উপকরণ সংগৃহীত হয়, পূর্বোক্ত 'শরীয়তী' বিধি-নিষেধগুলো দূরীভূত হবার মতো কি কি সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ঐ পরিস্থিতিকে যথাসময়ে ও সঠিকভাবে অনুধাবন করে আমরা নিজেদের জন্যে কি কর্মপন্থা উদ্ভাবন করি– এসব বিষয়ও আমি উল্লেখ করবো।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের আসল লক্ষ্যবস্তু কি ছিলো

এ ব্যাপারে সামনে অগ্রসর হবার আগে আপন লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের ভিতরকার প্রতিটি ব্যক্তিরই মন-মগজ খুব ভালোমত পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। বিশেষতঃ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সংশোধন এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রচেষ্টা অর্থাৎ 'রাজনীতি' একটি ব্যাধি ছিল, যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কোন এক সময় জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে হঠাৎ সংক্রামিত হয়েছে– এমনি ভুল ধারণায় কারো লিপ্ত থাকা উচিত নয়। আমি আমার বক্তৃতার প্রথম দিকে জামায়াতে ইসলামীর মূল উদ্দেশ্যের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করেছি, তাতে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ ছাড়াই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কর্তৃত্ব-শক্তির পরিবর্তন আমাদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে আন্দোলনের সূচনা থেকেই প্রধান ও বুনিয়াদী গুরুত্ব লাভ করেছে। বরং এর চাইতে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে কোনরূপ প্রতিবাদের আশংকা না করেই আমি একথা বলতে পারি যে, প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষত্বটিই সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে– অন্তত পাক-ভারত উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনকে অন্যান্য আন্দোলনের চাইতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এই জামায়াত শুধু আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও রসম-রেওয়াজের সংশোধন, কেবল ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন এবং এ ধরনের কতিপয় সংস্কার ও পুনর্গঠনমূলক কাজেই তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মশক্তিকে নিয়োজিত ও কেন্দ্রীভূত করেনি, বরং এই কাজগুলোকে সে এক বিরাট মৌলিক উদ্দেশ্যের উপায় বলে ঘোষণা করেছে। তার সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ঃ ক্ষমতার আসন থেকে ধ্বংসাত্মক জীবন ব্যবস্থাকে অপসারিত করে 'সত্য' দ্বীনকে এক সর্বাত্মক জীবন-পদ্ধতি হিসাবে বিজয়ী ও কর্তৃত্বশালী করে তোলা। এ জামায়াতের জন্মলাভের কারণই হচ্ছে এই যে, পূর্ণ দূরদৃষ্টি ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ একথাটিকে গাণিতিক হিসাবের ন্যায় এক অনস্বীকার্য সত্যরূপে সামনে রাখা হয়েছিলো যে ঃ

–ইসলাম নিছক একটি ধর্মমাত্র নয় যা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় যে কোন জীবন ব্যবস্থার কর্তৃত্বাধীনে থাকতে পারে, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি– জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগেই সে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কোনো অনৈসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাধান্য ও কর্তৃত্বাধীনে ইসলামের বিকাশ বা বৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নেই, বরং এরূপ ক্ষেত্রে ইসলামের যা কিছু অস্তিত্ব বাকী থাকবে, তাও বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনা– তাকে রক্ষা করার জন্যে ওয়াজ-নছিহত, তাবলীগ-তাফসীর, লেখনী চালনা ইত্যাকার উপায়ে যতো শক্তিই যোগানো হোক না কেন।

–প্রকৃত বিপর্যয়ের শিকড় হচ্ছে কুফরী ও ফাসেকী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। এর কারণেই একটি খোদা-বিমুখ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এবং জীবনে সকল দিক ও বিভাগে প্রভাবশীল হয়। এজন্যে যারাই প্রকৃত ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং কার্যত তার প্রতিষ্ঠাকামী হবে, নেতৃত্বের আসন থেকে কুফরী ও ফাসেকী ব্যক্তিকে অপসারিত করে ঈমানদার ও সৎ লোকদের সেখানে অভিষিক্ত করাই তাদের সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই সংশোধনমূলক বিপ্লবের জন্য সম্ভাব্য সকল বৈধ ও যুক্তিসংগত পন্থাই অবলম্বন করা কর্তব্য। বস্তুতঃ এই চিন্তাধারা যারা কবুল করেছিলো, তাদের সমন্বয়েই 'জামায়াতে ইসলামী' গঠিত হয়।

সুতরাং আজ সেই সকল লোকদের পক্ষে আপন আন্দোলনের মূল বুনিয়াদ সন্দেহযুক্ত হয়ে যাওয়া এবং যাকে আবশ্যকীয় বিষয় রাখা বা না রাখা আজকে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে পরবর্তী কালের 'সংক্রামিত ব্যাধি' মনে করে বসার চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুতঃ আমাদের জন্যে এই আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয়া জামায়াতে ইসলামীকে 'জামায়াতে ইসলামী' রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলারই শামিল। কেননা, এই উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক তাবলীগ ও সংশোধন এবং চিন্তা-গবেষণাকারী একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া জামায়াতে ইসলামী কিছুতেই হতে পারে না।

আন্দোলনের ক্রমিক পর্যায়সমূহ ঃ

এই জরুরী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পর আন্দোলনের সূচনা থেকে দেশ ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোন্ ক্রমিক ধারায়, কি কি কাজ করা হয়েছে, ঐতিহাসিক পরম্পরার সাথে তা আমি আপনাদের সামনে পেশ করবো।

প্রথম পর্যায় ঃ

এ পর্যায়টি ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে এক ব্যক্তির সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রয়াস ছাড়া কাজ করবার আর কোন উপকরণই বর্তমান ছিল না। তদুপরি সুযোগ-সুবিধা বলতে এটুকু মাত্র ছিলো যে, এক কঠিন বিভ্রান্তিকর পরিবেশে সে লোকটি ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু পেশ করতে চেয়েছিলো এক নগণ্য-সংখ্যক লোক তা পড়বার ও শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিলো। এই পরিস্থিতিতে হিকমতের সাথে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে কিছু লোককে এই চিন্তাধারায় বিশ্বাসী করে তোলা এবং এর জন্যে বুদ্ধিমত্তার সাথে কার্যত কিছু করার জন্যে তাদেরকে প্রস্তুত করাই ছিলো করবার মতো একমাত্র কাজ এবং এ ছাড়া অন্য কিছু করাও তখন সম্ভব ছিলো না। এ পর্যায়ে কাজকে বুঝতে হলে আপনারা বিশেষভাবে الجهاد فى الاسلام (আলজিহাদ ফিল ইসলাম)-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ (مصلحانہ جنگ)

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول ومبادی (ইসলামী তাহজীব আওর উসকে উছুল ওয়া মোবাদী) ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা এবং ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব (তানকীহাত) মনোবিবেশ সহকারে পড়ুন।

এর ভিতর প্রথম পুস্তকে একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়ায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ (امر بالمعروف ونهى عن المنكر) করার জন্যে যে আন্তর্জাতিক দলটির অভ্যুদয় ঘটেছে, প্রকৃতপক্ষে তারই নাম হচ্ছে মুসলমান। আর বাতিল রাষ্ট্র-শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে খোদায়ী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই কর্তব্য কিছুতেই পালন করা যেতে পারে না।

দ্বিতীয় পুস্তকে ইসলামী ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, তার দার্শনিক ভিত্তি ও স্বাভাবিক দাবীগুলো বিবৃত করে বলা হয়েছে যে, এ একটি ব্যাপকতর সভ্যতা দুনিয়াবী জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগকে আত্মস্থ করা এবং সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ার যোগ্যতাই এর রয়েছে।

তৃতীয় পুস্তকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, নিছক আকিদা-বিশ্বাস ও এবাদত-বন্দেগীর উপর নির্ভর করে ইসলামী জীবন-পদ্ধতি কোন কুফরী ও ফাসেকী জীবন ব্যবস্থার আদর্শিক ও বাস্তব কর্তৃত্বাধীনে বেঁচে থাকতে পারে না। বরং খোদ আকিদা-বিশ্বাস ও এবাদত-বন্দেগীও তার নিজের জায়গায় টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। এই ব্যাপকতর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যকে নিশ্চিহ্ন

করে যতোক্ষণ না ইসলামের ব্যাপকতর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনো সংগ্রাম করা হবে, ততোক্ষণ কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দ্বারাই ফলোদয় হবে না।

বস্তুতঃ এই বুনিয়াদী কাজের ফলেই মানব সমাজের ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের আসল কারণগুলো চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং লোকদের মন-মানসে জীবন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়টি হচ্ছে এর দ্বিতীয় পর্যায়। এ সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলন এমন এক চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে, যার ফলে এ আন্দোলনের প্রভাব শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে প্রায় নিশ্চিত মনে হয়। আর এই জয়লাভ না জানি ভারতের মুসলমানদেরকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং যে নগণ্য পুঁজিটুকু এদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্যে সহায়ক হতে পারে, তা-ও বুঝি শেষ হয়ে যায়– এ সময় এটাই ছিলো সবচাইতে বড়ো আশংকা। ঐ সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কামিয়াবীর ফলে বিচ্ছিন্ন ও অসংঘবদ্ধ মুসলমানরা কিরূপ প্রভাবিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তাদের সেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে নিজেদের ভিতর গ্রাস করে নেবার জন্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা দৃশ্যত 'গণ-সংযোগ' (Mass-Contact) এবং গোপনে যে 'শুদ্ধি' আন্দোলন শুরু করেছিলো তা এই উপমহাদেশে ইসলামের ভবিষ্যতের জন্যে এক কঠিন বিপদের আলামত ছিলো। এ সময়টিকে যারা স্বচক্ষে ও সচেতনভাবে দেখেছেন, তাদের একথা নিশ্চয়ই মনে আছে। তখন ইসলামের সাথে এদেশের যে কওমটি বিশ্বাস, ভাবাবেগ ও ঐতিহাসিক কারণে সম্পর্কযুক্ত ছিলো ইসলামী সভ্যতার প্রচার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য অন্যান্য উপায়-উপাদানের তুলনায় যাকে ব্যবহার করা সবচাইতে বেশী সহজ ও স্বাভাবিক ছিলো এবং যার ভেতর থেকে এ আন্দোলনের জন্যে সবচাইতে প্রথম ও সর্বাধিক সংখ্যক কর্মী ও সাহায্যকারী লাভ করার আশা করা যেতো, সেই কওমটিকে দেশ-ভিত্তিক জাতীয়তার কবল থেকে রক্ষা করা এবং তার ভেতর ইসলামী সভ্যতার সংরক্ষণের প্রেরণা জাগিয়ে তোলাই ছিলো আমাদের আন্দোলনের দৃষ্টিতে সবচাইতে প্রধান কাজ। **مسلمان اور موجوده سیاسی کشمکش** এর প্রথম দুই খন্ড এবং **مسئله قومیت** মাছালায়ে কাওমিয়াত (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) নামক পুস্তকদ্বয় এ যুগেরই সৃষ্টি।

এর ভিতর প্রথম পুস্তকে ভারতের মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, তোমাদের মাথার উপর ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের চাইতেও অনেক বেশী প্রচণ্ড এক বিপ্লব ঝড়ের বেগে এসে পড়ছে এবং তোমাদের সামনে আর বড়োজোর ১০/১৫ বছরের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর এই আসন্ন
বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং মুসলমানদের নানা দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে ঐ দুর্বলতাগুলোর বর্তমানে এ ধরনের বিপ্লবের আগমন এদেশে ইসলামের ভবিষ্যতের উপর কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়। তারপর এই নীতিগত সত্যগুলো তাদের মনে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়ঃ

–একটি বাতিলের জায়গায় আর একটি বাতিলকে প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের কাজ নয়। কাজেই ইংরেজ জাতির কুফরী সরকারকে অপসারিত করে ভারতীয় জাতির কুফরী হুকুমত কায়েম করা এমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, সেজন্যে মুসলমানরা অনুপ্রাণিত হবে।

–একটি কুফরী ব্যবস্থাপনার অধীনে নিছক আইনগত সংরক্ষণী–রাজনীতিকরা যার সবুজ বাগিচা তোমাদের দেখিয়ে থাকে– এদেশে ইসলামী সভ্যতার স্থায়িত্বের পক্ষে এতটুকু সহায়ক হতে পারে না।

"মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ" প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড বর্তমানে 'তাহরীকে আজাদী হিন্দ আওর মুসলমান' এ নামে প্রকাশিত হয়েছে।

–ভারতীয় জাতীয়তার সয়লাব থেকে বাঁচবার জন্যে ইংরেজের কোলে আশ্রয় নেয়া এবং এই উদ্দেশ্যেই এখানে ইংরেজের শাসন ক্ষমতার স্থায়িত্ব কামনা করা শুধু ভ্রান্তই নয়, তোমাদের পক্ষে চরম লজ্জাজনকও।

–তোমাদের নিজেদের মধ্যে জীবনী শক্তির সৃষ্টি করা এবং সেই শক্তিকে সঠিক পথে, সঠিক লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেবার জন্যে ব্যবহার করা ছাড়া তোমাদের কোনই গত্যন্তর নেই।

–এদেশ পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি 'দারুল ইসলামে' পরিণত হবে– মুসলমান হিসাবে অন্তত এটুকু তোমাদের কামনা হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পুস্তকে ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস ভারতে যে ধর্মহীন গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র (Secular Democratic National State) কায়েম করতে

"মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বর্তমানে 'তাহরীকে আজাদী হিন্দ আওর মুসলমান' এ নামে প্রকাশিত হয়েছে।

চেয়েছিলো এবং মুসলিম সমাজের অনেক নাদান নেতা পর্যন্ত যাকে 'স্বদেশের আজাদী' নাম দিয়ে মুসলমানদের জন্যে স্বাধীনতার আন্দোলন বলে মনে করেছিলেন, তার প্রতিটি অংশ কি অর্থ বহন করে, পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করে তা বলে দেয়া হয়। পরন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে ঐ নীতিগুলো প্রয়োগ করলে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এবং কার্যত ঃ কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি চলতে দেয়া হলে শেষ পর্যন্ত তা কিভাবে এদেশে থেকে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে ফেলবে, তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এই সমস্ত আলোচনার পর মুসলমানদের সামনে প্রথম পুস্তকের চাইতেও অধিকতর স্পষ্ট এক লক্ষ্যবস্তু পেশ করা হয়। কিন্তু এ পুস্তকের ভূমিকাতেই একথা ইশারায় বলা হয় যে, এ-ও চরম লক্ষ্য নয়, বরং আসল লক্ষ্যপথে 'আর একটি পদক্ষেপ মাত্র।

তৃতীয় পুস্তকে জাতীয়তার মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সে যুগে এ পুস্তকটি সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এদেশের সকল বাসিন্দাকে 'এক জাতি' আখ্যা দিয়ে ধর্মহীনতা ও গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে তাদের একটি মাত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেছিলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম সমাজের বড়ো বড়ো ধর্মীয় নেতা পর্যন্ত এই মতবাদটির বুনিয়াদী ত্রুটি এবং এর অনিবার্য পরিণামকে উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। এ কারণেই তারা মুসলমানদেরকে এ ধরনের জাতীয়তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার শুধু পরামর্শই দিচ্ছিলেন না, বরং এ ব্যাপারে ইসলামের দিক থেকে কোন আপত্তি নেই বলে প্রমাণ করতেও চেয়েছিলেন। আলোচ্য পুস্তকে একদিকে 'জাতীয়তার' এই আধুনিক মতবাদ এবং অন্যদিকে মুসলিম জাতির ঐক্য ও মিলনের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুলনামূলক সমালোচনা করে দুটি বস্তু যে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী এবং মুসলমান কখনো মুসলমান থেকে পাশ্চাত্য ধরনের জাতীয়তাবাদ কবুল করতে কিংবা অমুসলিমদের সংগে এক জাতি হয়ে ধর্মহীন গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না, একথা সুস্পষ্ট করে তোলা হয়।

বস্তুতঃ জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তনে এই তিনখানি পুস্তকই 'মাইলপোস্টের' গুরুত্ব রাখে। কারণ এর মাধ্যমেই প্রথমবার সমসাময়িক কালের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে ঘটনা প্রবাহকে নিজেদের লক্ষ্যপানে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। তখনো যদি প্রথম

যুগের মতোই নিছক চিন্তা ও গবেষণামূলক কাজের দ্বারা মানস-গঠনের চেষ্টাই করা হতো, তাহলে আজ পর্যন্তও হয়তো এই চিন্তাধারার সমর্থক লোকদেরকে সংঘবদ্ধ করে আসল লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবার জন্যে জামায়াতে ইসলামী নামে কোনো আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারতো না। কিন্তু সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হলেও, সমসাময়িক যুগের গুরুতর সমস্যাবলীতে যেহেতু অংশগ্রহণ করা হয় এবং সে সম্বন্ধে জনসাধারণকেও এ প্রামাণ্য ও যুক্তিসম্মত পথনির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়, সে জন্যেই এ দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং এক বিপুল সংখ্যক লোককে এদ্বারা প্রভাবিত করার সুযোগ পাওয়া গেল। এর ফলে শুধু যে ভাবী জামায়াতে ইসলামীর জন্যে তখন থেকেই কর্মী-সংগ্রহের ব্যবস্থা হলো তাই নয়, বরং এদ্বারা বড়ো ফায়দা এই হলো যে, তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুকাবেলা করার জন্যে মুসলিম সমাজে যে বিরাট আন্দোলনটি দানা বেঁধে উঠে, সে আন্দোলনও এই পুস্তকগুলো থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং তার শিরা-উপশিরায় শুরু থেকেই এই চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়ে যায়। বস্তুতঃ এর ফলেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই নয়া রাষ্ট্রটিকে ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা মুসলিম লীগ নেতৃত্বের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

এ পর্যায়ে কাজকে সঠিকরূপে বুঝতে হলে উল্লিখিত তিনখানি পুস্তকের সঙ্গে ঐ যুগেরই অপর পুস্তক خطبات (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা) ও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এই পুস্তকটিও বিশেষ করে জিহাদ সম্পর্কে এর শেষ প্রবন্ধ দু'টি আপনারা মনোযোগ সহকারে পড়লে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে, তখন মুসলমানদের হযম-শক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে দারুল ইসলামের চিত্র 'রাষ্ট্রের ভিতর রাষ্ট্র', 'সভ্যতার স্বকীয়তা' ইত্যাকার নামে তাদেরকে কিছু হালকা ধরনের খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে বটে; কিন্তু তাদেরকে আসল লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে তখনো চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয়নি। 'জিহাদ' সম্পর্কিত প্রবন্ধ দু'টিতে একথা তাদের সামনে স্পষ্টভাবে পেশ করা হয় যে ঃ

–রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংশোধন ছাড়া না অন্যায় ও পাপকে নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে, আর না গণ-সংশোধনের কোনো পরিকল্পনা চলতে পারে।

–দ্বীন প্রকৃতপক্ষে নিজের প্রতিষ্ঠা চায়, আর কার্যত প্রতিষ্ঠিত জীবন পদ্ধতিরই নাম হচ্ছে 'দ্বীন'।

–বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁর অধীনে বিজিত জীবন পদ্ধতি চলতে পারে না।

–গোটা জীবন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করাই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত দাবী।

–আপন উদ্দেশ্যের জন্যে জীবন পূর্ণ করাই হচ্ছে সত্যিকার ঈমানের পরিচয়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ

এরপর শুরু হলো লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রগতির পর্যায়। এটি ১৯৩৯ সাল থেকে জামায়াতের গঠনকাল (১৯৪১ সালের আগস্ট মাস) অবধি বিস্তৃত। বস্তুতঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। অন্যকথায়, এটি হচ্ছে জামায়াতের প্রস্তুতি-পর্ব। এ সময় লোকদের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে ইসলামী লক্ষ্যের পথ পেশ করা হয় এবং তখন লোকেরা আর যেসব পথে ছুটে চলছিলো, তার সাথে ইসলামের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। এরই ফলে অবশেষে সেই কঠিন গোলযোগ ও রাজনৈতিক ডামাডোলের সময়ও একদল লোক এই পথে চলবার জন্য তৈরি হয় এবং জীবন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কার্যত একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এ পর্যায়ে কাজকে সঠিকরূপে বুঝতে হলে যে অবস্থায় কাজ করা হয়েছিল, সে অবস্থাটিও আপনাদের সামনে থাকা দরকার। ১৯২২ সালের পর ভারতে এমন একটি যুগের সূচনা হলো যে, একদিকে এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ অনৈক্য, চিন্তার বিভ্রান্তি ও আত্মঘাতী কাজে লিপ্ত হতে লাগলো, অন্যদিকে গান্ধিজীর নেতৃত্বে হিন্দু জাতীয়তা দিন দিন এক প্রচণ্ড শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে ইংরেজ শাসক-শক্তির স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য হতে লাগলো। ফলে উভয় শক্তির মধ্যকার পার্থক্য দিন দিন প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। এমনকি, পনেরো বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে এর পরিণতি একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ন্যায় প্রকাশ পেলো, অর্থাৎ ভারতের এক বিরাট অংশে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। তখনই একথা স্পষ্টরূপে মনে হতে লাগলো যে, ইংরেজ শাসকশক্তি এর মোকাবেলায় আর বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। এই পরিস্থিতি দেখে মুসলমানরা শুয়ে পড়তে পড়তেই আবার ধড়মড়িয়ে উঠলো। তাদের ভিতর এক নয়া জাতীয় আলোড়নের সৃষ্টি হলো। এই আলোড়ন মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যেই জাতির বিশাল অংশকে নিজের প্রভাবাধীন করে নিলো। মোটকথা, এই

আন্দোলন শুরু হয়েছিল এক আতংক ও বিভীষিকার মধ্যে; এছিলো এক আকস্মিক উদ্দীপনার পরিণতি মাত্র। এর মূলে কোনো সুসংবদ্ধ চিন্তা, কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা বর্তমান ছিলো না। নানা ধরনের পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি, পরস্পর বিরোধী ঝোঁক প্রবণতা ও স্বার্থ-উদ্দেশ্য এ আন্দোলনে শামিল হয়েছিলো এবং ক্রমাগত হচ্ছিলো। এর প্রতি সাধারণ লোকেরা আকৃষ্ট হচ্ছিলো শুধু ইসলামের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণেই। আর এরই ফলে তারা ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কামনা করছিলো। কিন্তু এ আন্দোলনটি চালিত হচ্ছিলো খালেছ জাতীয়তাবাদের ধরনে; এর ভেতর কোনো দ্বীনী ভাবধারার স্পষ্ট নিদর্শন খুঁজে পাওয়া ছিলো এক দুষ্কর ব্যাপার। এমনি আন্দোলনের পরিণতিতে যদি দেশ বিভক্ত হয় (১৯৩৯ সালে যার জোরালো দাবী শুরু হয়েছিলো) তো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এক ধর্মহীন গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই সম্ভবপর ছিলো না।

অর্থাৎ এখানেও কংগ্রেসী ধরনের সেই কুফরী ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হবে। পার্থক্য থাকবে শুধু এই যে, এক জায়গায় এর চালক হবে কোনো রামপ্রসাদ আর অন্যত্র এর কর্ণধার হবে কোন আবদুল্লাহ। উল্লিখিত দুই ভাবধারার মাঝখানে বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক শিক্ষিত এবং দ্বীনদার লোকদের আর একটি দল ছিলো। তারা যুক্তি প্রদর্শন করতেন যে, পয়লা এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র– তা ধর্মহীনই হোকনা কেন– প্রতিষ্ঠা করা এবং অতঃপর তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ। এই ধরনের যুক্তি-প্রমাণে সাধারণভাবে লোকেরা নিশ্চিন্ত চিত্তে মনে করতে লাগলো যে, বাস্তবিক এই পথেই ইসলামী লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে।

সেই যুগে মুসলমানদের ভিতরকার আর একটি শক্তিশালী দল বলতো যে, আমরাও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চাই, কিন্তু সে জন্যে প্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে যোগদান করে ইংরেজ শাসক শক্তির কাছ থেকে আজাদী লাভ করতে হবে, অতঃপর স্বাধীন ভারতে সেই উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে– এই হচ্ছে তার পথ! এই দলটিতে দেশের খ্যাতনামা ও সম্মানিত আলেমদের অবস্থিতি লোকদের পক্ষে এক মারাত্মক ধোকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

তখন আরো একটি আন্দোলন বড়ো জোরে-শোরে চলছিলো। এটিও ইসলামী রাষ্ট্রকে নিজেদের চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করতো, কিন্তু সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে ফৌজী সংগঠনকেই তারা যথেষ্ট মনে করতো। এক বিরাট অংশ এই দলের প্লাটফর্মেও সমবেত হয়েছিলো।

এই পরিস্থিতিতে যতোটুকু কাজ করা সম্ভব হয়েছে (মনে রাখবেন যে, এ কাজও নিছক একজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ই চলছিলো আর সুযোগ-সুবিধার অবস্থা ছিলো এই যে, সমসাময়িক যুগের সমস্ত আন্দোলনের সাথে মতানৈক্যের কারণে সে যুগটি এ কাজের জন্যে নিতান্তই প্রতিকূল ছিলো), তাকে আমরা তিনটি বড়ো বড়ো অংশে ভাগ করতে পারি ঃ

প্রথম কাজ এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী মতবাদ এবং তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লোকদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়, যাতে করে লোকদের ভিতর যে জিনিসটির অনুসন্ধিৎসা জেগেছে, তার স্বরূপ তারা খুব ভালোমতো উপলব্ধি করতে পারে। এ কাজটি তখনকার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এর ভিতর 'আল্লাহর পথে জিহাদ' (মে, ৩৯), 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' (ডিসেম্বর, ৩৯), এবং 'শান্তিপথ' (এপ্রিল, ৪০) নামক পুস্তকাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর প্রথম উদ্দেশ্য ছিলো যে, লোকেরা যেনো তাদের ঈপ্সিত বস্তুটির সঠিক পরিচয় জেনে নিয়ে তাকে অর্জন করার জন্য যথাযথ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। আর এটা যদি সম্ভব নাই হয় তবে ভবিষ্যতে কোনো নেতৃত্বে যেনো ধর্মীয় চালবাজী দ্বারা তাদের ইপ্সিত জিনিসটি অর্জিত হয়ে গেছে বলে ধোকা দিতে না পারে, লোকদেরকে অন্তত সে সম্পর্কে এতোটুকু ওয়াকিফহাল করে তোলা।

দ্বিতীয় কাজ এই যে, লোকদের ভেতর তখন ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে সংশয় মিশ্রিত আগ্রহ জেগে ওঠে। তাই মূলতঃ ইসলামী সভ্যতা জিনিসটা কি, অন্যান্য সভ্যতার সাথে এর মৌলিক পার্থক্য কি এবং এর পুনরুজ্জীবন কিরূপ ব্যাপকতার সাথে, জীবনে কোন্ কোন্ দিক ও বিভাগে, কি কি ধরনের প্রচেষ্টা চায়, সর্বোপরি এই সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ও স্থিতির জন্যে একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, পক্ষান্তরে মুসলমানদের জাহেলী রাষ্ট্র এর পথে কতো বড়ো বাধার সৃষ্টি করতে পারে– এসব কথা তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলা হয়। একাজের নিদর্শনও আপনারা সে

যুগের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় পাবেন। বিশেষভাবে تجديد واحيائے دين[১] 'তাজদীদ ওয়া ইহইয়ায়ে দ্বীন' (ফেব্রুয়ারী, '৪০) এবং 'ইসলাম ওয়া জাহেলিয়াত' (ফেব্রুয়ারী, '৪১) নামক পুস্তকদ্বয় এই বিষয়ের উপরই লিখিত। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, যেসব চিন্তাশীল ও সমঝদার লোক নিজেদের অন্ধ প্রবৃত্তির উর্ধে উঠে কার্যত কিছু করতে ইচ্ছুক তারা যেনো তাদের ঈপ্সিত বস্তুটির সত্যিকার পরিচয় এবং তা অর্জন করার জন্যে কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা জেনে নিতে পারে।

তৃতীয় কাজ এই যে, ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তার বেশুমার মিশ্রিতরূপ তখন গণমনে বিভ্রান্তির জঞ্জাল জমিয়ে রেখেছিল। একে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে ইসলামী জীবন পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার জন্যে কি ধরনের আন্দোলনের প্রয়োজন এবং মুসলমানদের মধ্যে যে আন্দোলনগুলো চলছে, তা কেন এই মহান লক্ষ্যে উপনীত হবার সঠিক পথ হতে পারে না, এ সত্যকে লোকদের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয়। এ কাজ '৩৯ সালের জুলাই থেকে '৪১ সালের সূচনা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিখিত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে করা হয়, যা '৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে مسلمان اور موجوده سياسى كشمكش- (মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ) তৃতীয় খণ্ড নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া '৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' নামক বক্তৃতায়ও এ কাজই করা হয়। এ কাজের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, তখনকার মুসলমানগণ যে দু'টি গুরুতর রকম ভুল ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো, এর মাধ্যমে তার নিরসন করা হয়। তখন কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের প্রতি বিমুখ হয়ে মুসলমানরা এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করছিলো এবং সাধারণ মুসলমানের কাছে অন্তত তার উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী লোকদের নিয়ে গড়ে উঠা এবং দ্বীনী প্রেরণা ও ভাবধারা ছাড়া নিছক জাতীয়তাবাদী নীতিতে চালিত একটি নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পন্থা বলে গ্রহণ করে তারা এক মারাত্মক ভুল করে বসলো। তাদের দ্বিতীয় ভুল ছিলো এই যে, প্রথমে মুসলমানদের একটি ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা হবে, অতঃপর তাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পন্থা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এর জবাবে তাদেরকে বলা হলো যে,

---

১. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন।

আপনাদের যদি বাস্তবিকই খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য হয়, তবে আপনাদের অনুসৃত পথ কিন্তু সে লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ নয়, বরং তার জন্যে একটি ভিন্ন ধরনের আন্দোলনের প্রয়োজন, যার অমুক অমুক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে। তাদেরকে এও বলে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের একটি ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র– তা গণতান্ত্রিক হোক না কেন– এ উদ্দেশ্যের পথে সহায়ক না হয়ে বরং উল্টো প্রতিবন্ধকই হয়ে থাকে। কাজেই এ উদ্দেশ্য অবধি পৌঁছবার আশায় আপনারা ঐ পেঁচানো পথ অনুসরণ করবেন না। বরং এ উদ্দেশ্যের দিকে যে সোজা পথটি চলে গেছে সেই পথেই অগ্রসর হোন। مسلمان اور موجوده سیاسی کشمکش তৃতীয় খণ্ডের প্রবন্ধ اسلام کی راہ راست اور اس سے انحراف کی مراحلیں - এবং 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' এই উভয় প্রবন্ধেরই বিষয়বস্তু ছিলো এই। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, মুসলমানরা যেনো আন্দোলনের সূচনাতেই সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে।

চতুর্থ পর্যায় ঃ

কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, জাতীয়তাবাদের পথে তখন যে আন্দোলন যাত্রা করেছিলো, শেষ পর্যন্ত তা সেই পথেই এগিয়ে চলে। এমনকি, মুসলিম সমাজের অধিকাংশই তার ভেতর বিলীন হয়ে যায়। আর '৪১ সালের আগস্ট মাসে যখন ইসলামী পন্থায় সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালানোর জন্যে খোলাখুলি আহ্বান জানানো হয়, তখন ৩৫ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৭৫ জন লোক একাজের জন্যে জমায়েত হয়।

এখান থেকে আমাদের আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়। এ সময় আন্দোলন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার গণ্ডী অতিক্রম করে সম্মিলিত প্রচেষ্টার গণ্ডীতে প্রবেশ করে। তখন থেকে ১৯৪৭ সালের বিপ্লব পর্যন্ত আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে পরিস্থিতিতে কাজ করেছি, সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই ঃ

প্রথমেই উপায়-উপকরণের অবস্থা দেখুন। আমাদের সংগঠন মাত্র ৭৫ জন লোক নিয়ে শুরু হয়। ছ'বছরে আমাদের সদস্য সংখ্যা ৬২৫-এ উন্নীত হয়। এর সঙ্গে সক্রিয় সহানুভূতিশীল লোকদের শামিল করলে তাও দেড়-দু'হাজারের বেশী হবে না। এরা সবাই গরীব কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

"মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ" তৃতীয় খণ্ডের প্রবন্ধ "ইসলাম কি রাহে রাসত আওর উসসে এনহেরাফ কি মারাহেলে"।

এরপর সুযোগ-সুবিধা দেখুন। তখন দেশে ইংরেজ শাসকশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সে শাসক-শক্তির বিদায় গ্রহণের কোন দূরতম লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না। অথচ তাদের শাসন-ক্ষমতার স্থলাভিষিক্ত হবার জন্যে দেশে দু'দুটো প্রকাণ্ড আন্দোলন লড়াই করছিলো। তারা দেশের সমগ্র অধিবাসীর দৃষ্টিকেই নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে নিয়েছিলো। পরন্তু দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী শুধু ইসলামে অবিশ্বাসী নয়, তার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষে অন্ধ হয়েছিলো। আর মুসলমানদের সঙ্গে জাতীয় লড়াইয়ের ফলে তাদের এই বিদ্বেষ দিন দিন বেড়ে চলছিলো। সর্বোপরি তারা তখন জাতীয়তাবাদের নেশায় চুর হয়ে গিয়েছিলো। এই কারণে তাদের সামনে ইসলামকে একটি আদর্শ হিসাবে পেশ করার জন্যে এ পরিবেশটি মোটেই অনুকূল ছিলো না। বাকী থাকলো দেশের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী, অর্থাৎ যারা মুখে অন্তত ইসলামের দাবীদার ছিলো। তখন তাদের উপরও মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিলো এবং নিজেদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম হলে, পরে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা যাবে, এই বিশ্বাসে তারা নিজেদের সমগ্র শক্তিকে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করেছিলো।

সেই সঙ্গে শরয়ী' বিধি-নিষেধও আমাদের পথে প্রতিবন্ধক ছিলো। কারণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছিলো খালেছ ধর্মহীন গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধনের দরজা ছিলো অবরুদ্ধ। অথচ কোনো সশস্ত্র বিপ্লব বা গুপ্ত আন্দোলনের পথ অনুসরণ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না। কারণ এক গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার বর্তমানে এবং খোলাখুলি প্রচার-প্রোপাগান্ডা মারফত জনমত গঠন ও পরিবর্তন সাধনের সুযোগ থাকতে ঐ সকল পন্থা অনুসরণের কোনই শরয়ী' অজুহাত ছিলো না।

এই পরিস্থিতিতে দাওয়াত প্রচারের তামাম সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে যথাসম্ভব বেশী লোককে একমনা করে তোলা, অতঃপর তাদের ভিতর থেকে এই উদ্দেশ্যে কাজ করতে ইচ্ছুক লোকদেরকে স্বতন্ত্রভাবে জমায়েত করে এবং ট্রেনিং দিয়ে বিকল্প নেতৃত্বের দায়িত্ব বহনের উপযোগী একটি আদর্শ জামায়াত সংগঠন করা এবং সর্বোপরি লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধার জন্যে অপেক্ষা করা– এই ছিলো আমাদের কাজের পদ্ধতি।

তখন দেশের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনে একটি প্রশ্ন সবচাইতে বেশী তোলপাড় করতো। তা হলো এই যে, একটি সুসংবদ্ধ অনৈসলামী রাষ্ট্র– আর তাও আধুনিক যুগের রাষ্ট্র; জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের উপর এর চাইতে বেশী প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কোনো প্রাচীন যুগেই ছিলো না– যেখানে বর্তমান এবং যার বেশীর ভাগ অধিবাসীই অমুসলমান, সেখানে আমাদের ঈপ্সিত বিপ্লব কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে? মনে করুন, আমরা দেশের বেশীর ভাগ অধিবাসীর চিন্তাধারা, মানসিকতা, নৈতিক মান, সবকিছুই পরিবর্তিত করতে কামিয়াব হলাম, তবুও তো কুফরী শাসন-ব্যবস্থা আপনা আপনি খতম হয়ে যাচ্ছে না। তাকে পরিবর্তন করার জন্যে তো আমাদের কোনো বাস্তব পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু ধর্মহীন রাষ্ট্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আমাদের আকিদার খেলাফ বলে আমরা যদি এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচনের পন্থা গ্রহণ করতে না পারি, তবে কি আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করবো? অথবা কোথায়ও হিজরাত করে মদীনা তাইয়েবার ন্যায় কোনো রাষ্ট্র কায়েম করবো এবং তারপর জিহাদ করে এদেশকে 'দারুল ইসলামে' পরিণত করবো? কিংবা মসীর অনুগামীদের ন্যায় কোনো 'কনস্টানটাইন' মুসলমান হয়ে নিজেই এখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে দেবে এ আশায় দু'তিন শ' বছর পর্যন্ত প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা ও দুঃখ-দুর্গতি বরদাশত করতে থাকবো?

এইসব প্রশ্ন তখন বার বার আমার সামনে পেশ করা হয়। এই ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে আমি 'তরজুমানুল কোরআনে' একবার লিখেছিলাম ঃ

'আদর্শ ভিত্তিক কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, প্রথমে আমরা আমাদের দাওয়াত প্রচার করবো। অতঃপর যারা আমাদের দাওয়াত কবুল করবে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে থাকবো। তারপর জনমতের কিংবা অবস্থার পরিবর্তনের কারণে কখনো যদি প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আমাদের হস্তগত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং সমাজের নৈতিক, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিজস্ব আদর্শে ঢালাই করতে পারব বলে আশা করা যায়, তবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আমরা এতোটুকু বিলম্ব করবো না। কারণ আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে নিজেদের উদ্দেশ্যের সাথে, কোন বিশেষ পদ্ধতির (Method) সঙ্গে নয় কিন্তু শান্তিপূর্ণ পন্থায় যদি প্রকৃত ক্ষমতা (Substance of

Power) লাভের আশা করা না যায়, তাহলে আমরা সাধারণ দাওয়াত অব্যাহত রাখবো এবং তামাম বৈধ শরয়ী' পন্থায় বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা করে যাবো।'[১]

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ঐ সময় লেখা হয়েছিলো ঃ

কোন অনৈসলামী শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে কোন ধর্মহীন (Secular) গণতান্ত্রিক (Democratic) রাষ্ট্র চালনার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং আইন পরিষদের সদস্য হওয়া আমাদের তাওহীদ-বিশ্বাস ও দ্বীন-ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু দেশের জনমত যদি কখনো আমাদের আকিদা ও উদ্দেশ্যের এতোটা সমর্থক হয় যে, অধিকাংশ লোকের সহায়তায় আমরা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে পারবো বলে সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে এ পদ্ধতিতে আমাদের কাজ না করার কোনই কারণ নেই। যে জিনিসটি নির্ঝঞ্ঝাটে সোজা পথেই পাওয়া যেতে পারে, তাকে অযথা বাঁকা আঙ্গুলের দ্বারা বের করার কোনো নির্দেশ শরীয়াত আমাদেরকে দেয়নি। কিন্তু একথা খুব ভালোমতো মনে রাখবেন, এই কর্মনীতি আমরা কেবল তখনই অবলম্বন করবো, যখন–

এক, দেশে এমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে, কোনো ব্যবস্থার জন্যে নিছক জনমত তৈরি হওয়াই কার্যত তার প্রতিষ্ঠার জন্যে যথেষ্ট।

দুই, আমরা আমাদের দাওয়াত ও তবলীগের দ্বারা দেশের অধিবাসীদের বৃহত্তম অংশকে নিজেদের চিন্তাধারার অনুসারী করে তুলতে পারবো এবং ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে দেশে সাধারণ দাবী উত্থিত হবে।

তিন, নির্বাচন অনৈসলামী শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে না, বরং দেশের ভাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোন্ শাসনতন্ত্রের উপর কায়েম করা হবে, এই ইস্যুতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[২] এর সাথে ১৯৪৩ সালের দারভাঙা সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার আর একটি উদ্ধৃতি আমাদের তখনকার অনুসৃত নীতিকে (Policy) উপলব্ধি করার ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হবে। উক্ত বক্তৃতায় বলা হয় ঃ

'আমাদের গণ-আন্দোলন (Mass Movement) শুরু করার আগে আদর্শ ইসলামী চরিত্রের অধিকারী এবং চিন্তাধারার পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নেতৃত্বের দ্বৈত দায়িত্ব পালনে সক্ষম, এমন উন্নত ধরনের প্রতিভাবান

---

১. رسائل ومسائل প্রথম খণ্ড ৫০১ পৃষ্ঠা। আসলে এই প্রবন্ধ তরজুমানুল কোরআন '৪৫ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২. প্রথম খণ্ড ৪৬২-৬৩ পৃষ্ঠা رسائل ومسائل প্রবন্ধও ১৯৪৫ সালের তরজমানুল কুরআনের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

লোকদেরকে তৈরি করতে হবে। এই কারণেই আমি আন্দোলনকে জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার পক্ষপাতী নই। বরং দেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রতিভাবান শ্রেণীকে প্রভাবিত করা এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও অধিকতর সৎ লোকদেরকে বেছে নিয়ে জনসাধারণের নেতা এবং তাদের তাহজীব-তমদ্দুনের নির্মাতারূপে গড়ে তোলার জন্যেই আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি। এ কাজ যেহেতু মস্তিষ্কে করতে হয় এবং একটি গণ-আন্দোলনের ন্যায় এর ভিতর কোনো আকস্মিক চাঞ্চল্য নেই, এজন্যে শুধু আমাদের হামদর্দ ও একমনা লোকেরাই নয়, বরং আমাদের কিছু সংখ্যক সদস্য পর্যন্ত বিরক্ত হতে শুরু করেছেন। তাই জামায়াতের সদস্যগণ কাজের এই নক্শাকে খুব ভালোমতো বুঝে নিন এবং নিজেদের শক্তি-ক্ষমতাকে বিরক্তির শিকারে পরিণত না করে কোনো লাভজনক কাজে নিয়োজিত করুন, এটাই আমি চাই। এই পরিকল্পনা মুতাবেক বিপুলসংখ্যক জনসাধারণকে উন্নত চরিত্ররূপে গড়ে তুলতে হলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে, এ ধারণা ঠিক। কিন্তু জনসাধারণের পরিশুদ্ধ হবার আশায়ই আমরা আমাদের বিপ্লবী প্রোগ্রামকে মুলতবী রাখতে পারি না। আমাদের সামনে বর্তমানে কাজের এই নকশা রয়েছে যে, জনসাধারণের নেতৃত্বের জন্যে এমন একটি ছোটোখাটো দল সংগঠন করতে হবে, যার প্রতিটি ব্যক্তিই উন্নত চরিত্রের সাহায্যে এক একটি এলাকার জনগণকে সামলাতে পারবে।তার ব্যক্তিসত্তা জনসাধারণের আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হবে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি জনগণের নেতৃত্ব লাভ করবেন। কিন্তু শুধু আকর্ষণ দ্বারাই কাজ চলে না। ঐসব কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের দ্বারা জনগণের শক্তি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যাতে ইসলামী বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত হয়, সে জন্যে মানসিক যোগ্যতারও প্রয়োজন। একটি বিরাট মজবুত ও ব্যাপকতর বিপ্লবের এই হচ্ছে আবশ্যিক প্রাথমিক পর্যায়। এই পর্যায়টিকে ধৈর্যের সঙ্গে অতিক্রম করতেই হবে। নচেৎ আন্দোলনের ধ্বংস অনিবার্য। বর্তমানে জনসাধারণকে সামলে নিয়ে চলবার মতো স্থানীয় নেতা (Local Leaders) নেই; এমতবস্থায় জনসাধারণকে যদি উস্কিয়ে দেয়া হয়, তবে তারা একেবারেই উচ্ছৃংখল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং নিজেদেরকে অযোগ্য লোকদের হাতে সঁপে দেবে।[১]

এই সমস্ত আলোচনা থেকে আপনারা এ কথা খুব ভালোমতোই বুঝতে পারেন যে, ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব শক্তির পরিবর্তন

১. কার্যবিবরণী প্রথম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা, ৬১-৬২

একেবারে অপরিহার্যরূপে শুরু থেকেই এ আন্দোলনের বুনিয়াদী চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এজন্যে উপায়-উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক যুগেই ক্রমাগত চেষ্টা-সাধনা চালানো হয়েছে। অবশ্য দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে যেরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, ইত:পূর্বে তেমনি ধরনের কিছু করা কার্যত সম্ভবপর ছিলো না। কারণ তার জন্যে না আমাদের কাছে কোন উপায়-উপকরণ ছিলো, না তখনকার অবস্থায় এর কোনো সুযোগ ছিলো, আর না শরয়ী' বিধি-নিষেধের কারণে আমরা এরূপ কিছু করতে পারতাম।

একটি ভুল ধারণার নিরসন ঃ

আজ কেউ কেউ অবস্থার পটভূমিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে سیاسی کشمکش তৃতীয় খণ্ড এবং 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করে কিছু কিছু ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বের করার চেষ্টা করছেন। এ জন্যে পরবর্তী আলোচনায় এই মানসিক বিভ্রান্তি যাতে বার বার পীড়া দিতে না পারে সে জন্যে বিভাগ-পূর্বকালের অবস্থার পর্যালোচনা প্রসঙ্গেই আমি ঐ ভুল ধারণাটি নিরসন করতে চাই। আগেই বলা হয়েছে যে, এই উভয় প্রবন্ধই ১৯৪০ সালে লিখিত। তখন মুসলমানরা একটি ধর্মহীন জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তো পেয়ে গেছে, এখন তাকে কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা যায়– এটা কোনো প্রশ্নই ছিলো না। বরং আমরা 'দারুল কুফরে' বাস করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিভাবে শুরু করবো এটাই ছিলো একমাত্র প্রশ্ন। এর জবাবে একদল লোক এই প্রস্তাব পেশ করে যে, প্রথমে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মারফত জাতীয়তাবাদেরই পরিচিতি ও প্রচলিত পন্থায় কাজ করে মুসলমানদের একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র– তা ধর্মহীন হলেও– প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতঃপর তাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘাঁটি হিসাবে আমরা ব্যবহার করবো এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মারফতে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করবো।এর জবাবে আমার যুক্তি ছিলো এই ঃ

(১) ঐ প্যাঁচালো পন্থা অবলম্বন না করে শুরুতেই কেন আপনারা সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হবার স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করেন না।

(২) মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে অথবা ভালো মাধ্যম হতে পারে, এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। বরং তার বিপরীত

এ জিনিস আরো বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং কখনো কখনো কুফরী রাষ্ট্রের চাইতেও বেশী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকে।

(৩) তখন নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করা তুলনামূলকভাবে কোনো সহজ কাজ হবে এ ধারণাও ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে আজকে (অর্থাৎ ১৯৪০ সাল) সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে যা কিছু করতে হবে, তখনো রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংশোধনের জন্যে সেই সব কাজই করতে হবে এবং আজ কাফেরগণ যেরূপ এ পথে বাধার সৃষ্টি করছে, তখনো একশ্রেণীর পথভ্রষ্ট মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক এমনি বাধারই সৃষ্টি করবে। কাজেই সবকিছু যদি তখনো দেখা দেয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আসল কাজ আমরা আজ থেকেই শুরু করি না কেন। আর যে মধ্যবর্তী বস্তুটি সাহায্যকারীর পরিবর্তে প্রতিবন্ধক হয়েই দাঁড়াবে, তার প্রতিষ্ঠার জন্যে কেন আমরা সময় ও শক্তির অপচয় করি। এই ধারা তিনটিকে সামনে রেখে আপনারা 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' শীর্ষক اسلام کی راہ راست اور اس سے انحراف کی مراحلیں -প্রবন্ধদ্বয় মনোযোগ সহকারে পড়লেই তখনকার প্রধান বিতর্কমূলক প্রশ্নটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং আমাদের তখনকার ভূমিকাও সঠিকভাবে জানা যাবে।

বিশেষভাবে প্রথমোক্ত প্রবন্ধের এই অংশটি লক্ষণীয় ঃ

'রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থা জীবনের গভীর মর্মমূলে শিকড় গেড়ে থাকে। তাই সমাজ জীবনে যতোক্ষণ না কোনো মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হবে, ততোক্ষণ কোনো কৃত্রিম পন্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে না। আমি বুঝতে পারি না, গণতান্ত্রিক পন্থায় যে জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম হবে, তা এই বুনিয়াদী সংশোধন কার্যে কিভাবে মদদগার হতে পারে! গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোট দাতাদের মনোনীত ব্যক্তিদের হাতেই শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। কাজেই ভোট দাতাদের মধ্যে যদি ইসলামী মানসিকতা, ইসলামী চিন্তাধারা ও সঠিক ইসলামী চরিত্র না থাকে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষ আদল-ইনছাফ ও সুসামঞ্জস্য নিয়ম-নীতিকে তারা মেনে চলতে প্রস্তুত না হয়, তবে তাদের ভোটে কখনো খাঁটি 'মুসলমান' নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদের সদস্য হতে পারে না। এমনি পন্থায় তো যারা আদম শুমারীর রেজিস্টারে মুসলমান হিসাবে উল্লিখিত অথচ চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থার দিক দিয়ে ইসলামের হাওয়া পর্যন্ত যাদের স্পর্শ করেনি, কেবল তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ

করবে। এ ধরনের লোকদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হবার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা অমুসলিম রাষ্ট্রে যেখানে ছিলাম সেখানে কিংবা তার চাইতেও নিকৃষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে আছি। কেননা ইসলামের লেবেল আঁটা এ জাতীয় রাষ্ট্র সত্যিকার ইসলামী বিপ্লবের পথে অমুসলিম রাষ্ট্রের চাইতেও অধিকতর বেপরোয়া ও নির্ভীকতার সাথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। অমুসলিম রাষ্ট্র যে কাজের জন্যে কারাদণ্ড দিয়ে থাকে, এই 'মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র' তার জন্যে ফাঁসী ও নির্বাসনদণ্ড দান করবে। এতদসত্ত্বেও এই রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ জীবিতকালে 'গাজী' এবং মৃত্যুর পর 'রহমাতুল্লাহে আলাইহে' খেতাবই ধারণ করে থাকবেন। কাজেই এ ধরনের জাতীয় রাষ্ট্র কোনো দিক দিয়ে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির ব্যাপক সহায়ক হতে পারে বলে মনে করা নিতান্তই ভুল। যদি সেই রাষ্ট্রেও আমাদের সমাজ জীবনের ভিত্তি বদলানোরই চেষ্টা করতে হয় এবং এ কাজ রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই, বরং তার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নিজেদের কোরবানীর বিনিময়েই করতে হয়, তাহলে আজ থেকেই আমরা সে পথ কেন অনুসরণ করি না?'

এ কথাটিই শেষোক্ত প্রবন্ধে এমনিভাবে বিবৃত করা হয়েছে ঃ 'একথা নিঃসন্দেহ যে, জনসাধারণকে নৈতিক ও মানসিক ট্রেনিং দিয়ে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে, তাদের ভেতর মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব সৃষ্টি করে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ইসলামী হুকুমতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলমানদের কুফ্‌রী রাষ্ট্র কি কিছুমাত্র সহায়ক হবে? যারা বর্তমান বিকৃত জনসমাজের বস্তুগত স্বার্থের কাছে আবেদন জানিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে কামিয়াব হবে, তারা রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ, উপায়-উপকরণ ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন এবং তাদেরকে ইসলামী হুকুমতের নাগরিক রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করবে, এরূপ আশা কি করা যেতে পারে? বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এর নেতিবাচক জবাব ছাড়া আর কিছুই দেয়া যেতে পারে না। বরং সত্য কথা এই যে, এ ধরনের লোকেরা এই বিপ্লবের ব্যাপারে সাহায্য করার পরিবর্তে উল্টো তার বিরোধিতাই করবে। কেননা তারা একথা ভালো করেই জানে যে, জনগণের মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি পরিবর্তন সূচিত হয়, তবে এই পরিবর্তিত সমাজে তাদের স্বার্থের প্রদীপ জ্বলতে পারবে না। বরং এর চাইতেও ভয়ংকর কথা এই যে, নামকাওয়াস্তে মুসলমান হবার কারণে এরা এমনি ধরনের যে কোন প্রচেষ্টাকে কাফেরদের চাইতেও বেশী সাহস

ও নির্ভীকতার সঙ্গে দমন করবে, এমন কি এদের জুলুমের গোপনীয়তার জন্যে এদের নামোচ্চারণই যথেষ্ট হবে। অবস্থা যখন এই, তখন যে ব্যক্তি ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এমনি এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করবে– যা কুফ্‌রী রাষ্ট্রের চাইতেও এ লক্ষ্যের পথে বেশী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে– তাকে নাদান ছাড়া আর কি বলা যায়?'

পরন্তু ১৯৪০ থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে চলমান দুনিয়া যে কতোখানি বদলে গেছে, তা আপনাদের কার অজানা রয়েছে? ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৪০ সালে যে পন্থা আমি নির্দেশ করেছিলাম, মুসলমানরা সমষ্টিগতভাবে তাকে গ্রহণ করেনি। বরং আমি যেটাকে প্যাঁচালো পথ বলেছি, সেই 'মধ্যবর্তী বস্তুটির' জন্যেই তারা সচেষ্ট থাকে। এমন কি, যে ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, তা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়ক হবার পরিবর্তে কঠিন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা মোটেই সহজ কাজ হবে না। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে সেই রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সব কিছু প্রকাশ পাবার পর কেউ যদি আমাকে বলে যে, আমার নির্দেশিত বিপদাশংকাগুলো এক্ষণে দূর করার পরিবর্তে এগুলো প্রকাশ পাবার আগেই সত্য করে দেখানোর চেষ্টা করাই উচিত ছিলো– তবে তাকে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলবো না বুদ্ধির ভ্রান্তি– ভেবে পাচ্ছি না। নিঃসন্দেহে আমি বলেছিলাম যে, জাহেল নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হতে পারে না, কাজেই এই মধ্যবর্তী জিনিসটির জন্য চেষ্টা করার পরিবর্তে আসল লক্ষ্যের জন্যে সরাসরি চেষ্টা করাই কর্তব্য। কিন্তু সেই মধ্যবর্তী জিনিসটি যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আমার পূর্ব আশংকা মতোই তাকে ইসলামের পথে কঠিন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে দেয়াই আমাদের উচিত হবে এবং তাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করা অনুচিত হবে– তার অর্থ কি এই ছিলো, না এক্ষণে এমনি অর্থ গ্রহণ করা সংগত? নিঃসন্দেহে আমি একথাও বলেছিলাম যে, মুসলমানদের জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে; কেননা সাধারণ ভোট দাতাদেরকে গোমরাহ করে নেহাৎ অসচ্চরিত্র লোকেরা সেখানে শাসন-ক্ষমতায় অভিষিক্ত হবে এবং তারা কাফেরদের চাইতেও বেশী সাহসিকতার সঙ্গে ইসলামের পথ রোধ করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এমনি ধরনের রাষ্ট্র যখন

জন্মলাভ করবে, তখন তাকে অসচ্চরিত্র লোকদের হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিত এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় তার নেতৃত্ব পরিবর্তনের চেষ্টা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত– তা দ্বারা কি এই যুক্তি প্রদর্শন করা চলে? ১৯৪০ সালে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি একটি কর্মনীতি পেশ করেছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু '৪৭ সাল অবধি পৌঁছতে পৌঁছতে ঘটনাপ্রবাহে যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করা এবং পরিবর্তিত অবস্থায়ও নিজেদের প্রাথমিক কর্মনীতিতে কোন রদবদল না করা কি কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হতো? নিঃসন্দেহে আমি সেই কর্মনীতিকে নবীদেরই নীতি বলেছিলাম এবং আজো তা বলি; কিন্তু কোন বুদ্ধিমান লোক একটি কর্মপন্থার বুনিয়াদী নিয়ম-নীতি এবং বাস্তব অবস্থার উপর তার প্রয়োগ ও সংস্থাপনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য করবে না– তার কাছ থেকে এ আশা পোষণ করি না। সে কর্মপন্থার বুনিয়াদী নিয়ম-নীতিকে আমরা কখনো পরিবর্তিত করিনি, না তাকে আমরা পরিবর্তিত করতে চাই। কিন্তু যে ব্যক্তি অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মূলনীতির বাস্তবায়নের রূপ বদল না করবে, আমার কাছে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন আনাড়ী চিকিৎসকের মতো, যে কোনো ডাক্তারী বইয়ের একটি নকশা নিয়ে বসে গেছে এবং চোখ বুঁজে সমস্ত রোগীর উপরই তা হুবহু প্রয়োগ করছে।

১৯৪৭ সালের বিপ্লব ঃ

বস্তুতঃ ১৯৪৭ সালে যেইমাত্র আমরা হঠাৎ এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম, তখনই আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং পরিস্থিতির যে দিকে মোড় ঘুরছিলো, তাকে ঠিক ঠিক মতো অনুধাবন করে নিজেদের আন্দোলনের জন্যে এক নতুন পন্থা উদ্ভাবনের যোগ্য করে দেন। একে আমি আল্লাহ্ তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ বলেই মনে করি। দেশ ভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ পেতেই তার পরিণতিটা একেবারে জ্যামিতিক জবাবের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে, অতঃপর হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে একই কর্মপন্থা কোনোক্রমেই চলতে পারে না। আমাদের একথা বুঝতেও এক মুহূর্ত দেরী হয়নি যে, ১৯৩৭ ও '৩৮ সালে سیاسی کشمکش প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিলো, হিন্দুস্তানে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তার চাইতেও কঠিনতর পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে হবে।

আর '৩৯ ও '৪০ সালে سیاسی کشمکش তৃতীয় খণ্ডে যে খোলাখুলি ইশারা করা হয়েছিলো, পাকিস্তানে সে পরিস্থিতি পুরো মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করবে। আর এই উভয় দেশে আন্দোলনের কর্মপন্থাকে কিভাবে নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে, খোদার ফযলে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও আমাদের কোনো বেগ পেতে হয়নি।

এই জিনিসটিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে আপনারা جماعت روداد পঞ্চম খণ্ডে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ সম্মেলনে প্রদত্ত আমীরে জামায়াতের বক্তৃতা এবং ঐ বছরই '৪৭ মে মাসে দারুল ইসলাম সম্মেলনের বক্তৃতা جماعت اسلامی کی دعوت নামে যা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে– মনোনিবেশ সহকারে পড়ুন। এর ভিতর প্রথম বক্তৃতায় হিন্দুস্তানে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ কি এবং তার মুকাবেলায় হিন্দু সংখ্যাগুরুদেরকেই বা কিরূপ ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে হবে, আর এমনি পরিস্থিতির ভেতর ইসলামের জন্যে কাজ করার পথই কিভাবে খোলাসা হবে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রথম বক্তৃতার সঙ্গে এর একমাত্র উদ্দেশ্যগত ঐক্য ছাড়া আর কোনো সামঞ্জস্য নেই। এতে ভারতের যে অংশে মুসলিম সংখ্যাগুরুগণ শাসন-ক্ষমতা লাভ করবে, সেখানে আমরা কোন্ কোন্ মূলনীতির উপর এক নয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করবো, তা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়।

উভয় বক্তৃতা তুলনামূলকভাবে পড়লে আপনাদের সামনে এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে, একটি আন্দোলন বছরের পর বছর ধরে একই উদ্দেশ্যে একই কর্মধারায় চালিত হলেও দুটি নতুন রাষ্ট্র জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিকে যথাসময়ে আন্দাজ করে নিয়ে কিভাবে দুই দেশের জন্যে দুটি ভিন্ন কর্মসূচী উদ্ভাবন করা হয়। অথচ জাহেলী জীবন ব্যবস্থাকে অপসারিত করে ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করার সেই একই উদ্দেশ্যই বর্তমান রয়েছে এবং দাওয়াত, সংগঠন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাহেলী নেতৃত্বের মুকাবেলায় এক ইসলামী নেতৃত্বের সৃষ্টি করা, লক্ষ্য অর্জনের জন্যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করা কর্মপন্থার এই বুনিয়াদী নীতিও অপরিবর্তিত রয়েছে।

ষষ্ঠ ধারা

এবার আমার প্রস্তাবনার ষষ্ঠ ধারা বিশ্লেষণ করে আপনাদেরকে বলতে হবে যে, দেশ বিভাগকালে এবং তার অব্যবহিত পরে পরিস্থিতির কি বিরাট ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার দাবী বিভাগ-পূর্বকালের পরিস্থিতির চাইতে কিরূপ ভিন্ন ধরনের ছিলো, ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিতে এর অনুকূল দিক কি ছিলো; তার ভিতর কাজ করার জন্যে কি নতুন সুযোগ-সুবিধা আমাদের সামনে এসেছে এবং কি নয়া উপায়-উপকরণ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি; দেশ ভাগের পূর্বে আমাদের পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে বদলানো এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টির যে দরজা শরয়ী' নিষেধাজ্ঞার কারণে সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো, তাকে খোলবার কি নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে; এই গোটা পরিস্থিতির যথাসময় সঠিকভাবে আন্দাজ করে আমরা আমাদের সাবেক কর্মপন্থার যেটুকু পরিবর্তন করেছি, তার প্রকৃত স্বরূপ কি ছিলো এবং কেন সেই পরিবর্তন শুধু অপরিহার্যই ছিলো না, বরং ঐ পরিস্থিতিতে বিভাগ-পূর্ববর্তী কালের পন্থায়ই কাজ করতে থাকলে আমাদের উদ্দেশ্যের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হতো ইত্যাদি বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

দেশ ভাগকালে অবস্থার পরিবর্তন এবং তার দাবী

আমি আগেই বলেছি যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে আমরা যখন কাজ করছিলাম, তখন দেশে বিদেশী কাফেরদের শাসন ব্যবস্থা পুরোমাত্রায় কায়েম ছিলো; আর সেই সঙ্গে ভৌগোলিক জাতীয়তার বুনিয়াদের উপর এক পাকাপাকি ধর্মহীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিলো প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু দেশের তিন-চতুর্থাংশের চাইতেও বেশীর ভাগ অধিবাসী ছিলো অমুসলিম আর ইসলামের অনুগামীদের সংখ্যা ছিলো এক-চতুর্থাংশের চাইতেও কম। সংখ্যালঘুগণ এক প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আশ্রয় নিয়েছিলো এবং শিগ্‌গিরই তারা ইংরেজ শাসকশক্তির উত্তরাধিকার লাভের আশায় বিভোর হয়েছিলো। মুসলিম সংখ্যালঘুগণ একটি পাল্টা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরণার্থী হয়েছিলো এবং দেশ বিভক্ত হয়ে তার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে কোনো না কোনো প্রকারে মুসলমানদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক– এই ছিলো তার মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এই উভয় আন্দোলন যখন গোটা ময়দান শুধু দখলই করেনি, বরং পরস্পরে এক তীব্র সংগ্রামেও লিপ্ত, ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে আমাদের এই

আদর্শবাদী আন্দোলন ঠিক তখনই শুরু হয়েছিলো। একথা সুস্পষ্ট যে, এমনি পরিস্থিতিতে আমরা যে কর্মনীতির ভিত্তিতে কাজ করছিলাম তা ছাড়া আর কিছুই তখন সম্ভবপর ছিলো না।

তখন পাকিস্তানের যে প্রাথমিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্যে মুসলিম লীগ জোরদার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো, তা ছিলো এই যে, তাতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো তো অবশ্যই শামিল হবে, কিন্তু তাতে অমুসলিম সংখ্যালঘু প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ থাকবে। আর এই বিপুল সংখ্যক অমুসলিমের সঙ্গে মুসলমানদের পাশ্চাত্য ঘেঁষা ও বস্তুবাদী শ্রেণীও যে ইসলামের পথ রোধ করার ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, এটা স্বভাবতই ধারণা করা হয়েছিলো। এই কারণেই দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা কার্যকরী হলে ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিতে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের অবস্থা বেশী কিছু ভিন্নতর হবে এবং আমরা পাকিস্তানে অবিভক্ত ভারতের কর্মনীতির বেশী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ হবো, এ আশা পোষণ করা খুবই কঠিন ছিলো।

কিন্তু দেশ-বিভাগ যখন কার্যকরী হলো, তখন একে একে এমন সব পরিবর্তন সূচিত হলো, যা পূর্বে কেউ কল্পনা করেনি। আর এইসব পরিবর্তন দেখতে না দেখতে সমস্ত পরিকল্পনাই বদলে ফেললো।

প্রদেশসমূহের বিভক্তিকরণ ও লোক বিনিময় ঃ

সর্বপ্রথম পরিবর্তন ছিলো এই যে, পাঞ্জাব, বাংলাদেশ ও আসাম বিভাগ কার্যকরী হলো। এর ফলে পাকিস্তান তার প্রাথমিক পরিকল্পনার তুলনায় অনেক বেশী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো।

এরপর ঠিক বিভাগকালে এর চাইতেও বড়ো এবং সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এই দেখা দিলো যে, পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক লোক-বিনিময় কার্যকরী হলো। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান শতকরা ৯৮ ভাগ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রায় ৮০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হলো।

এই বিরাট পরিবর্তনের ফলে পাকিস্তানের জীবন পদ্ধতি তথা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয় শুধু মুসলিম জনমতের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়লো– অবিভক্ত ভারতে যা নির্ভরশীল ছিলো অমুসলিম জনমতের উপর। এই বিরাট পার্থক্য সূচিত হবার পর অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কাজ করার জন্যে আমরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম, এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে তা থেকে

ভিন্নতর পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলো। যদিও মুসলমানদের নৈতিক ও আকিদাগত দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে নিছক 'মুসলমান' হবার কারণেই একটি ইমারত দাঁড় করিয়ে দেখা নেহায়েত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক; কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস, তার সঙ্গে তাদের আন্তরিক সম্পর্ক এবং তার দিকে তাদের স্বাভাবিক ঝোঁক-প্রবণতাকে উপেক্ষা করে কোনো ইসলাম বিরোধী বা ইসলামে অবিশ্বাসী জনসমাজের ন্যায় তাদের মধ্যে কাজ করাও কোনো অংশেই কম নির্বুদ্ধিতাজনক নয়।

বস্তুতঃ কোনো দেশে এক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীর বর্তমান ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সপক্ষে জনমত তৈরির সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার না করা এবং তাতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা-সাধনার সম্ভাব্য খোলা পথকে বন্ধ মনে করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কাজ হতে পারে না। কারণ এথেকে কমপক্ষে এইটুকু ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে যে, যে সময়টাতে সমাজকে নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে সৎ নেতৃত্ব ও ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার জন্যে তৈরি করার চেষ্টা হবে, সেই সময়ে তাকে প্রতিরোধ ও বরবাদ করার জন্যে ফাসেক নেতৃত্ব যাতে কোনো ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করতে অথবা বাতিল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আরো বদ্ধমূল হতে না পারে, তজ্জন্যে জনমতকে সেই প্রচেষ্টার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করা হলে এ থেকে এ ফায়দাও হাসিল করা যেতে পারে যে, গণ-সমর্থন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতিল জীবন পদ্ধতিকে পিছু হটানো এবং সত্য জীবন-ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্রমিক কার্যধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে গঠনমূলক প্রচেষ্টা এবং গণ-আন্দোলন উভয়ই পাশাপাশি চলতে থাকবে। পরিশেষে এই উভয় কর্মপ্রচেষ্টাই এক নির্দিষ্ট পরিণতিতে গিয়ে সমাপ্তি লাভ করবে।

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, আপনারা কোনো জায়গায় যেনো একটি মসজিদ তৈরি করছেন। আপনাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই মসজিদটিকেই সমগ্র এলাকার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে হবে। কিন্তু একটি সয়লাব এসে এই নির্মাণকার্যকে যে কোনো সময় প্রতিরোধ করতে কিংবা বরবাদ করেও দিতে পারে, এমনি একটা বিপদাশংকা হামেশা আপনাদের মগজের উপর চেপে রয়েছে। এমতবস্থায় আপনাদের চারধারে যদি এমনি কোনো মুসলিম অধিবাসী বর্তমান থাকে, যারা নামায হয়তো পড়ে না, কিন্তু মসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন এবং মসজিদ নির্মাণের প্রতিও সহানুভূতিশীল, তাহলে তাদের ভাবাবেগের কাছে কিছুটা

আবেদন জানিয়ে অন্ততঃ সয়লাবের সামনে বাঁধ তৈরীর ব্যাপারে তাদেরকে ব্যবহার করার ফায়দাটুকু অবশ্যই হাসিল করা যেতে পারে। কিন্তু এই আবেদনটুকুই হেকমত ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে করা হলে মসজিদ রক্ষার প্রেরণা সৃষ্টির সাথে সাথে নামায পড়াবার এবং মসজিদ নির্মাণের কাজে কারিগর ও মিস্ত্রি হবার জন্যে ঐ জনসমাজ থেকেই যে বিপুলসংখ্যক লোক বেরিয়ে আসবে না, এরও কোনো কারণ নেই। পরন্তু এই মসজিদটিকে সমগ্র এলাকার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করাই যদি আপনাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে মসজিদ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে গণ-আবেদন অব্যাহত রাখার পরিণাম ফল এই দাঁড়াবে যে, মসজিদের নির্মাণকার্য যেদিন সম্পূর্ণ হবে, সেদিনই এলাকার কেন্দ্রস্থলেও পরিণত হবে। এর পরিবর্তে প্রথম কয়েক বছর আপনারা শুধু মসজিদ তৈরির কাজে ব্যয় করবেন এবং তারপর তাকে এলাকার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করার জন্যে সচেষ্ট হবেন, সম্ভবতঃ এ প্রস্তাব কোনদিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ ইত:মধ্যেই সয়লাব এসে মসজিদ নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিতে পারে অথবা এই মধ্যবর্তী সময়ে আশ-পাশের লোকেরা গীর্জা বা মন্দিরের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে বসতে পারে।

সাবেক ধর্মহীন শাসনতন্ত্রের অস্থায়ী মর্যাদা লাভ ঃ

দ্বিতীয় মৌলিক পরিবর্তন এই ছিলো যে, বৃটিশ পার্লামেন্টের আইনটি (Indian Independence Act) হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের কাছে আজাদী-ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসন আমলের ধর্মহীন শাসনতন্ত্রই আপনা-আপনি অস্থায়ী শাসনতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করলো এবং দেশের জন্যে একটি নয়া শাসনতন্ত্রের প্রশ্ন দেখা দিলো।

এই পরিস্থিতিতে দেশের নয়া শাসনতন্ত্রকে দেশ ভিত্তিক জাতীয়তা ও ধর্মহীন গণতান্ত্রিক নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা এবং ইসলামী নীতির উপর তার ভিত্তি স্থাপনের জন্যে অবিলম্বে কাজ শুরু করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলো। এ কাজ শুধু নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের পথে ধর্মহীন গণতন্ত্রের সৃষ্ট বাধাস্বরূপ শরয়ী' নিষেধাজ্ঞা দূর করার জন্যেই জরুরী ছিলো না, বরং অমুসলিমদের ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় মুসলমানদের জাতীয় ধর্মহীন রাষ্ট্র যে ইসলামের পথে অধিকতর মারাত্মক প্রতিবন্ধক হয়ে

দাঁড়ায়, এই সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি সচেতন (১) বলেও প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া এই নবলব্ধ রাষ্ট্রটির জন্যে যখন নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, বরং প্রকৃত পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবন পদ্ধতি নির্ধারণের প্রশ্ন উঠে, তখন ধর্মহীন শাসনতন্ত্র তথা কুফরীর জীবন পদ্ধতির বিরোধিতা এবং ইসলামী নীতির ভিত্তিতে নয়া এমারত গড়ে তোলার জন্যে কোনো কার্যকরী চেষ্টা না করে এখানে ধর্মহীন জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরি বদ্ধমূল হলে এবং খোলা রাস্তা পেয়ে পূর্ণ শক্তিতে চিন্তা ও কর্ম উভয় দিক থেকে সমাজকে কুফরী ও ফাসেকী ছাঁচে ঢালাই করার কাজ শুরু করে দিলে তখন তাকে বদলানোর জন্যে দাবী উত্থাপন করলে আমাদের পক্ষে তা আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হতো না।

এর আরও একটি দিক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে এক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে এখানকার বেশীর ভাগ নাগরিককে তার বুনিয়াদী ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তার সমর্থক এবং তার জন্যে অনুসন্ধিৎসু করে তোলার চেষ্টা করাই হবে সবচাইতে জরুরী কাজ। এর একটি পন্থা এই হতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে উন্নতমানের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ পুস্তকাদি প্রকাশ করা এবং বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভিতর আমাদের নিজস্ব মতবাদকে চালু করার উদ্দেশ্যে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, আমাদের এই রাষ্ট্রের নয়া ব্যবস্থাপনার বুনিয়াদ সম্পর্কিত প্রশ্নটির যখন মীমাংসার প্রয়োজন হবে, তখন প্রকাশ্য ময়দানে নেমে নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের সামনে নিজেদের মতবাদ তুলে ধরা এবং যোগ্যতা-প্রতিভা অনুযায়ী প্রত্যেককে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে শুধু অবহিত নয়, তার দাবীদার, সমর্থক ও অনুসন্ধিৎসু বানানোরও চেষ্টা করা। আমি মনে করি, এই উভয় পন্থার মধ্যে তুলনা করে দেখলে আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে দ্বিতীয় পন্থাকেই অধিকতর কার্যোপযোগী বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ এই পন্থায়– অর্থাৎ লোকদের সঠিক পথ নির্দেশ করার মাধ্যমে আপনারা যতোখানি কাজ করতে পারেন, হাজারো বই লিখে ততোটা কাজ করা সম্ভবপর নয়। এমনি পরিস্থিতিতে

(১) এ সম্পর্কে مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش তৃতীয় খণ্ড এবং 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' নামক পুস্তকে আগেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ১৯৪৮ সালে যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী তোলা হয়, তখনো বিষয়টির এ দিকটি বারবার সুস্পষ্ট করা হয়। এ ব্যাপারে مطالبہ نظام اسلامی ১৬ পৃষ্ঠা ও ازادی کے اسلامی تقاضی ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

তো কয়েকটি মাত্র বাক্য বিরাট-বিরাট গ্রন্থের চাইতেও অধিকতর কার্যকরী এবং লোকদের মন-মগজে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে।

জাতীয় জীবনের শূন্যতা ঃ

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিলো এই যে, বিভাগ-পূর্বকালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে যে আন্দোলনটি এদেশের জনমানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, তা আপন লক্ষ্যস্থল পাকিস্তানে পৌঁছেই সহসা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ বিভাগ-উত্তরকালেও মুসলিম জনসাধারণকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে পারে, এমন কোনো ইতিবাচক ব্যবস্থা বা প্রোগ্রাম সে উদ্ভাবন করতে পারেনি। পরন্তু এই আন্দোলনের নিশানবাহী দলটি দেশ-বিভাগ এবং তার পরবর্তীকালে যে চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তা কয়েক মাসের মধ্যেই তার মর্যাদা ও নৈতিক প্রভাবের গগনচুম্বী প্রাসাদকে ধূলায় ভূলুণ্ঠিত করে দেয়।

তখন এই শূন্য ময়দানকে দখল করার উপযোগী অন্য কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলনও দেশে বর্তমান ছিলো না। এই শূন্যতা স্বভাবতই এমন একটি আন্দোলনকে সামনে অগ্রসর হয়ে দেশের জন-মানসকে প্রভাবান্বিত করার সুযোগ করেছিলো, যার পিছনে ছিলো মুসলমানদের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস, দ্বীনী আবেগ-অনুভূতি, শতাব্দীকালের ঐতিহ্য এবং প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত লিখিত বেশুমার বই-পুস্তকের বলিষ্ঠ সমর্থন এবং যে আন্দোলন নিজেও দেশ-বিভাগের পূর্বে তার আদর্শ ও চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলো। এই বিরাট সুযোগটি যদি আমরা হেলায় হারাতাম এবং নিজেদেরকে বিভাগ পূর্বকালের অবস্থায়ই রেখে দিতাম, তবে তা হতো আমাদের পক্ষে এক কঠিন নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কারণ তখন জনসাধারণের ভাবাবেগ যে কোনো দিকে ঘুরে যেতে পারতো এবং তা ঘুরানোও সম্ভবপর ছিলো। তবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাবীর দিকে তাদেরকে ঘুরানোই ছিলো সবচাইতে বেশী সম্ভাবনাময়। কারণ ধর্মতঃ তারা ইসলামে বিশ্বাসী ছিলো এবং এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নেক নিয়্যাতেই পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু তাদেরকে যদি এদিকে ঘুরানোর চেষ্টা করা না হতো তো তারা অরাজকতার (Anarchy) দিকে ঝুঁকতে পারতো। পাকিস্তানের নতুন শাসকবর্গের বাড়াবাড়ি ও অনাচার এর জন্যে যথেষ্ট সম্ভাবনারও সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে তারা কম্যুনিজমের দিকেও ঝুঁকতে পারতো।

মুহাজেরদের দুরবস্থা, জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি, শাসন-ব্যবস্থার খারাবী এবং জালেম শ্রেণীর শোষণ-লুণ্ঠন সে আগুন বিস্তারের জন্যে প্রয়োজনীয় খড়-কুটারও ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আজকে রুশ-তাবেদার দেশগুলোতে যে অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সীমান্তের নিকটে তার (রাশিয়ার) অবস্থিতি সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারতো। তারা জাতীয়তাবাদের দিকেও ঝুঁকতে পারতো। হিন্দু ও শিখদের সদ্য জুলুম-নির্যাতনের স্মৃতি, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সর্বোপরি কাশ্মীর প্রশ্ন এর জন্যে ময়দানও তৈরী করে রেখেছিলো। আর এ বস্তুটি যদি বদ্ধমূল হবার সুযোগ পেতো তো এই ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্রের মর্জীর বিরুদ্ধে দ্বীনী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিই এখানে 'গণশত্রু' (People's Enemy) এবং জাতির প্রতি 'বিশ্বাসঘাতক' অভিহিত হতো। এমন কি, আমাদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাবীকে বানচাল করার জন্যে ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর প্রশ্নে জনসাধারণের ভাবাবেগকে আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দেবার যে অপচেষ্টা করা হয়েছিলো, তা-ও আপনাদের ভুলে যাবার কথা নয়। এথেকে আপনারা এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারেন যে, জনসাধারণের ভাবাবেগকে ইসলামী আন্দোলনের পোষকতার জন্যে তৈরী করার ব্যাপারে আমরা যদি কিছুমাত্র গড়িমসি করতাম-তবে কিছুদিন পর এই দেশটিও আন্দোলনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুর্বর ও অনুপযোগী হয়ে যেতো।

ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঃ

তখন জনমনে একথা তীব্রভাবে জাগরূক ছিলো যে, সাত আট বছর ধরে যে পাকিস্তানের জন্যে তারা লড়াই করেছে এবং লক্ষ-লক্ষ মুসলমানের বুকের রক্ত, হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত-আবরু ও কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পদের কোরবানীর উপর যার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে তা ইসলামের নামেই অর্জিত হয়েছে এবং তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর প্রতিশ্রুতিই তাদেরকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র জিনিসটা কি এবং তার বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বই বা কি, একথা বড়ো বড়ো খ্যাতনামা আলেম পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে কেবল এইটুকু ধারণা পোষণ করতেন যে, রাষ্ট্র যে ধরনের এবং যে নীতি অনুসারী হোক না কেন, তাতে শায়খুল ইসলামী একটি পদ সৃষ্টি করা এবং বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা করার জন্যে 'শরয়ী' আদালতের ব্যবস্থা করে দিলেই ব্যাস ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে গেলো। তাই আমাদের ধর্মীয় মহল থেকে শুধু মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ, বেশ্যাবৃত্তির মূলোৎপাটন, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা এবং এ ধরনের

কয়েকটি খুঁটিনাটি দাবীই তখন উত্থাপিত হচ্ছিলো। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন ছিলো এক নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং পরিস্থিতির অনিবার্য দাবী; এ দাবী কোন না কোন দিক দিয়ে উত্থাপিত হতোই, বরং তা উত্থাপিত হতে শুরুও হয়েছিলো। কিন্তু তখন যদি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মতই সাধারণ মুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্য কিছু ধারণা করে বসতো এবং তার উপরই তাদের সমস্ত দাবী-দাওয়া কেন্দ্রীভূত হতো, তবে পরে আর কখনো তার বুনিয়াদী মতবাদ এবং সে সম্পর্কে ব্যাপক পূর্ণাঙ্গ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। এমনকি, এই মনস্তাত্ত্বিক সুযোগকে একবার হেলায় হারানোর পর পাকিস্তানের অধিবাসীদেরকে ব্যাপকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নির্ভুল ধারণার সঙ্গে পরিচিত করানো এবং তাদের মন থেকে তার সংকীর্ণ ধারণা দূরীভূত করে তাদের ভিতর আসল জিনিসটির অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে আমরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সক্ষম হতাম না।

মুসলিম জাতির অঙ্গ হিসাবে আমাদের কর্তব্য ঃ

তখন একটি মুসলিম জাতি সবেমাত্র আজাদী লাভ করেছে এবং নিজের জন্যে একটি জীবন পদ্ধতি মনোনীত করা ও নিজের জাতীয় জীবনের জন্যে বিভিন্ন সম্ভাব্য পথের মধ্য থেকে একটি মাত্র পথ নির্বাচন করার অধিকারও সে পেয়েছে। দেশভাগের আগে কাফেরদের গোলামীর যুগে সংখ্যাগুরু কাফের অধিবাসীদের চাপের মধ্যে ব্যক্তিগত ঈমানের সঙ্গে সামগ্রিক কুফরের পথে চলবার জন্যে কিছু-না কিছু ওজরের অবকাশ ছিলো। কিন্তু দেশভাগের পর নিজের পথ নির্বাচনে পুরোপুরি স্বাধীন হবার পরও যদি সে পুরনো পথই নির্বাচন করতো কিংবা সেই পথে চলতেই তুষ্ট থাকতো, তবে তা অনিচ্ছাকৃত নয়, বরং স্বেচ্ছাকৃত কুফরী হতো; এবং এরপর ব্যক্তিগত ঈমানের কোন মূল্য থাকতো না। বস্তুত এছিলো খোদার তরফ থেকে এক কঠিন ও সংকটজনক পরীক্ষাকাল। আমরা নবাগত হলেও সামনে অগ্রসর হয়ে এই মুসলিম জাতিটিকে এই পরীক্ষা থেকে নির্বিঘ্নে উদ্ধার করা আমাদের ঈমানের দাবী ছিলো। কিন্তু আমরা নবাগতও ছিলাম না। আমরা ছিলাম এই জাতির লোক এবং এরই মঙ্গল অমঙ্গলের শরীকদার। আমরা যদি এই কর্তব্য পালনে অগ্রসর না হতাম, তো এই অপরাধের পর আর কোন্ সৎকাজটি আমাদেরকে খোদার হাত থেকে রক্ষা

করতো? দেশের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আমাদের শাসনতন্ত্রের দাবীকে যেরূপ বিপুলভাবে সমর্থন দিয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সংকীর্ণ ধারণা পরিহার করে তার বুনিয়াদী মতবাদ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণাকে যেরূপ দ্রুততার ও ব্যাপকতার সাথে লোকেরা গ্রহণ করেছে, তা একথাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, চরিত্র ও নৈতিকতার দিক দিয়ে এ কওমটি যতোই দুর্বল হোক না কেন, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস পোষণের ব্যাপারে এরা মুনাফেক নয়। এথেকে একথাও প্রমাণিত হয় এ জাতি এই বিরাট পরীক্ষার সময় এক নির্ভুল নেতৃত্ব কামনা করছিলো। অতঃপর এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না যে, জনসাধারণকে তখন এমনি নেতৃত্বদান করাই ছিল আমাদের সবচাইতে বড়ো কর্তব্য। এ ব্যাপারে আমরা কিছুমাত্র গাফলতির পরিচয় দিলেও গুরুতর অপরাধে অপরাধী হতাম।

নয়া ফাসেক নেতৃত্বের বিপদাশংকা ঃ

তখন পুরনো ক্ষমতাশালী দলটির (ইংরেজ) বদ্ধমূল শক্তি উৎপাটিত হয়েছিলো এবং খোদ মুসলমানদের মধ্যে এক নয়া ক্ষমতাশালী দলের অভ্যুত্থান ঘটছিলো, যার কর্তৃত্ব তখনো পর্যন্ত সুদৃঢ় হয়নি। এই দলটি তার নিজস্ব ঝোঁক প্রবণতার দিকে গোটা দেশ ও জাতিকে চালিত করতে চাইছিলো। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ইসলাম সম্পর্কে এক মারাত্মক রকমের চিন্তার বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিযান শুরু করে দিয়েছিলো। অন্যদিকে তামাম শক্তি-ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণ নিয়োজিত করে গোটা জাতিকে তারা এমন এক নৈতিক বিকৃতির পথে চালিত করতে শুরু করছিলো, যাতে নিমজ্জিত হবার পর ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার শক্তি খুবই কম থাকতো। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক পর্যায়েই চিন্তার বিভ্রান্তি সৃষ্টির এই অভিযানকে প্রতিহত করা এবং সেই সঙ্গে ফাসেক-ফাজের ও খোদাদ্রোহী নেতৃত্বের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সুদৃঢ় হতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়টির বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন গড়ে তোলবার প্রয়োজন ছিলো। আজ আপনারা পাকিস্তানে এই উভয় ব্যাধির যে অবস্থা দেখছেন, তা গত দশ বছরের নিরাময়-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছেন, যদি সেই প্রচেষ্টা না চলতো এবং বিভাগ পূর্বকালের কর্মপন্থাই ধীর-স্থিরভাবে চলতেই থাকতো তো চিন্তার বিভ্রান্তি আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছতো এবং ফাসেকী ও খোদাদ্রোহিতা কিরূপ নিরাপদ ও স্বীকৃতি লাভ করতো, তা এ থেকেই আন্দাজ করতে পারেন।

গোটা উপমহাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ ঃ

সবচাইতে বড়ো কথা এই যে, তখন ভারতবর্ষে ইসলামের হাজার বছরকার ইতিহাস এক চরম সংকটজনক মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছিলো। এই উপমহাদেশে খোদার কালেমা প্রচারের জন্যে আমাদের সম্মানিত বুযুর্গগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, পাকিস্তানের বিনিময়ে ছেড়ে আসা হিন্দুস্তানের এক বিশাল অংশে অপরের দ্বারা এবং আমাদের চড়া মূল্যে অর্জিত দুটি ক্ষুদ্র অংশে নিজেদের ফাসেক ফাজের ও খোদাদ্রোহী ব্যক্তিদের দ্বারা ইসলাম নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হওয়ায় তার সমস্ত সুফলই খতম হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিলো। বস্তুতঃ ১৯৪৭ সালের এই ট্র্যাজেডীর সূচনাটা ছিলো আন্দালুসিয়ার পর আমাদের জাতীয় ইতিহাসে দ্বিতীয় এবং তার চাইতেও বৃহত্তর ট্র্যাজেডী! আর একে রোধ করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করাই ছিলো তখনকার দিনে সবচাইতে বড়ো প্রয়োজন। তখন আমার যা কিছু ধারণা-বিশ্বাস ছিলো, ১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার দাবী সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে প্রদত্ত বক্তৃতায় তা বার বার আমি বিবৃত করেছি ঃ

'আমাদের বুযুর্গগণ শত শত বছরের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে যে ইসলামের প্রচার করেছেন, আট শ' বছর পর তা আজ পাকিস্তানের দুটি অংশে সীমিত হয়ে পড়েছে। এমতবস্থায় আমরা যদি একটি পা-ও ভুল পথে বাড়াই তো ভারতবর্ষে ইসলামের হাজার হাজার বছরকার ইতিহাস একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই উপমহাদেশের তিন চতুর্থাংশে ইসলাম অপরের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। আর এখানে আমাদের নিজেদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হতে যাচ্ছে। এজন্যে আমাদের খুব ভেবেচিন্তে সামনে পা বাড়ানো উচিত। এক্ষণে আমাদের এবং ইসলামের নিশ্চিহ্ন হবার পথে শুধু একটিমাত্র আঘাতই বাকী রয়েছে। যদি এই সংকট-মুহূর্তে আমরা সে আঘাতটি খাই তো আমাদের প্রাচীন বুযুর্গদের দ্বীনী কৃতিত্বের গোটা ইতিহাসই 'ভ্রমশুদ্ধির' ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।[1] বস্তুত আমি যে আঘাত খাবার আশংকা প্রকাশ করেছিলাম তা শুধু খেয়ালী আশংকাই ছিলো না, বরং তখন যেসব প্রকাশ্য লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো, প্রকৃতপক্ষে তার ভিত্তিতেই এই নির্ভুল ও নিশ্চিত আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিলো যে, মুসলমানদেরকে যদি তা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা না হয়, তবে জাতি এই শেষ আঘাতটিও খাবে।

১. مطالبه نظام اسلامی ৬ পৃষ্ঠা।

جماعت اسلامی اس کا مقصد تاریخ اور لائحہ عمل নামক পুস্তকে আমি বিস্তারিতভাবে ঐ লক্ষণগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশও করেছি এবং নিম্নোক্ত ভাষায় উক্ত আলোচনার উপসংহার করেছি। এ থেকে তখনকার পরিস্থিতি আপনারা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন ঃ

"যখন দেশভাগের কথা ঘোষিত হলো, তখনই আমরা বুঝতে পারলাম যে, আজ পর্যন্ত আমরা ভাল-মন্দ যতোটুকু গঠনমূলক কাজই করেছি, তার উপরই এখন আমাদের নির্ভর করতে হবে এবং যে কওমটি কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাড়া, কোনো নৈতিক শক্তি ও সামগ্রিক সংশোধন ছাড়াই হঠাৎ ক্ষমতাশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে সামলানোর জন্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষতঃ দেশভাগের সময় এবং তার অব্যবহিত পরের অবস্থা দেখে জরুরী পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলিমদেরকে যেভাবে বহিষ্কার করা হলো অমুসলিমদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে যেরূপ ব্যবহার করা হলো এবং মুসলিম মুহাজেরগণ পাকিস্তানে এসে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো, তা সবই ছিলো একটি দর্পণ স্বরূপ। এই দর্পণে গোটা জাতির, তার সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর, তার নেতা ও ধর্মগুরুদের, তার শাসক ও কর্মচারীদের, দ্বীনদার ও দুনিয়াদারদের এক কথায় প্রতিটি ব্যক্তিরই নৈতিক ও সামাজিক চিত্র সম্পূর্ণ নগ্নরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। পরন্তু ক্ষমতা লাভ করেই আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ তথা শাসক সম্প্রদায় দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তিকর ও পরস্পর বিরোধী কথা বলতে শুরু করেন এবং প্রথম কয়েক মাস যাবত গোটা জাতিও যেভাবে শান্ত মস্তিষ্কে তা শুনতে থাকে, তা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, বর্তমানে একটি চিন্তা-ভাবনাহীন দলের হাতে একটি চেতনাশূন্য জাতির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এসে পড়েছে। কাজেই এটা শুধু চুপচাপ বসে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকার সময় নয়। এখন যদি একটি মুহূর্তও অপচয় করা হয় তো যারা কোনো লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ না করে এবং কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই যাত্রা শুরু করেছিলো, তাদের পক্ষে হঠাৎ কোনো ভ্রান্ত মতবাদকে এদেশের বুনিয়াদ বানিয়ে বসা মোটেই বিচিত্র নয়। অতঃপর সেই সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করানো বর্তমান সময় অপেক্ষা সহস্র গুণ বেশী কোরবানী ছাড়া হয়তো সম্ভবপরও হবে না।

দেশ-বিভাগকালে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থা ঃ

দেশ-ভাগের পর আমাদের যে পরিস্থিতি এবং যার চাহিদা ও অনুকূল-প্রতিকূল সম্ভাবনার সাথে মুকাবেলা করতে হয়, মোটামুটি তা ছিলো এই ঃ তখন জামায়াতে ইসলামীর বয়স হয়েছিলো মাত্র ছ'বছর। আমাদের সামনে কাজের যে পরিকল্পনা ছিলো তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো গণ-আন্দোলন শুরু করার আগে নিয়ম-শৃঙ্খলায় পাকাপোক্ত, নৈতিক চরিত্রের নির্ভরযোগ্য, মানসিক যোগ্যতা বিরোধী চিন্তা ও মতাদর্শগুলোকে পরাজিত করতে ও এক নয়া জীবন-পদ্ধতির প্রবর্তন করতে সমর্থ এবং নেতৃত্বের ব্যাপারে এক এক জন লোক এক একটি এলাকার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে ও জনসাধারণকে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা মুতাবেক যথারীতি উদ্বুদ্ধ করতে ও সুশৃংখলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম, এমন একটি কর্মীবাহিনী সংগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো। এ সকল দিক দিয়ে তখনো আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক অভাব বোধ করছিলাম এবং আপন জামায়াতকে তৈরি করার জন্যে অধিকতর সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। তখন ঐ অভাবগুলো আমরা পূর্ণ করবো কিনা, এ সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো প্রশ্ন ছিলো না, বরং আমরা একটি জামায়াত হিসাবে পরিস্থিতির ঐ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে সমর্থ কি-না, এটাই ছিলো আসল প্রশ্ন। অন্য কথায়, তখন কাজের সুযোগ-সুবিধা এবং পথের বাধা প্রতিবন্ধকতা দূর করার সম্ভাবনা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন আমাদের সামনে যে বিপদাশংকা দেখা দিয়েছিলো, তা আমাদের প্রস্তুতির পূর্ণতার পর ময়দানে অবতরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে– সমস্যার ধরনটি ঠিক এরকম ছিলো না, বরং প্রতিটি সুযোগই হাতছাড়া হয়ে যাবার, প্রতিটি সম্ভাবনাই বিনষ্ট হবার এবং প্রতিটি বিপদাশংকাই সংঘটিত হবার মতো সঙ্গীন পরিস্থিতিই আমাদের সামনে দেখা দিয়েছিলো। সুতরাং আমাদের তখন অবিলম্বে এবং যথাসময়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিলো যে, সমাগত সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করতে এবং স্পষ্ট দৃশ্যমান বিপদাশংকাকে প্রতিরোধ করতে পারি না– আমরা কি যথার্থই এতোটা কমজোর এবং অকর্মণ্য। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শক্তি যদি এতোটা কর্মোপযোগী না হয় এবং প্রশ্ন শুধু অধিকতর পূর্ণতার জন্যে চেষ্টা-সাধনা করাই হয়, তবে এই পূর্ণতার সাধনায় নিয়োজিত থাকা এবং তামাম সুযোগ-সুবিধা হাতছাড়া করা, সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করা এবং প্রতিটি সম্ভাব্য বিপদাশংকাকে সংঘটিত হতে দেয়াই কি আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে অধিকতর উপকারী হবে? অথবা যতোটুকু এবং যা

কিছু শক্তিই আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের দান করেছেন, তা নিয়েই কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং তার সাথে যতোখানি সম্ভব পূর্ণতার সাধনা চালিয়ে যাওয়াই অধিকতর বেহ্তর?

আমাদের কাছে প্রথম প্রশ্নের জবাব ছিলো তখন সম্পূর্ণ নেতিবাচক। আর আজ দশ বছরের অভিজ্ঞতায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তা নেতিবাচক হওয়াই উচিত ছিলো। প্রকৃতপক্ষে জামায়াতে ইসলামী তার শক্তি ও উপায়-উপকরণের দিক দিয়ে সমকালীন সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা থেকে ফায়দা হাসিল করতে এবং সম্ভাব্য বিপদাশংকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কখনোই অক্ষম ছিলো না।[১] তখন নিজেদের সম্পর্কে এমনি ধারণা পোষণ করলে আমরা নিশ্চিতরূপে এক কঠিন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতাম আর এই নির্বুদ্ধিতার যে খেসারত আমাদের ভোগ করতে হতো, তা হয়তো আজো আপনারা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারবেন না; কেননা খোদার ফযলে তেমনি নির্বুদ্ধিতা আমাদের দ্বারা হয়নি। কিন্তু এইমাত্র তখনকার পরিস্থিতির যে চিত্র আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তা থেকে আপনারা সে ভুলের কিছু না কিছু পরিণতি অবশ্যই ধারণা করতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কেও তখন আমাদের মধ্যে দ্বিমত ছিল না। বরং এ ব্যাপারে গোটা জামায়াত একমত ও একনিষ্ঠ ছিলো যে, একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে আমাদের বর্তমান শক্তি-সামর্থ ও উপায়-উপকরণ নিয়েই সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত। নতুবা আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে এতোবড়ো ক্ষতি সাধিত হবে যে, অধিকতর প্রস্তুতির কোন প্রচেষ্টা দ্বারাই আমরা তা পূরণ করতে পারবো না, বরঞ্চ কিছুদিন পর এই প্রস্তুতি করার মতো জায়গাই হয়তো আমরা খুঁজে পাবো না। তাছাড়া খোদ জামায়াতের দৃষ্টিতেও তখন খোদার উপর ভরসা করে সামনে এগোনো এবং কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করে লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সরাসরি সংগ্রাম শুরু করাই ছিলো এই প্রস্তুতির একমাত্র পথ। আজ হয়তো এ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে দ্বিমতের সৃষ্টি হতে পারে এবং কেউ হয়তো বিনা দ্বিধায় বলেও দিতে পারেন যে, তখন অধিকতর প্রস্তুতিতে নিয়োজিত থাকাই আমাদের উচিত ছিলো। কিন্তু বিষয়টি আজ ঐতিহাসিক রায় প্রদানের ফায়সালার মুহূর্ত সামনে রেখে মত স্থির করার নয়। আর এই ঐতিহাসিক রায় প্রদানকারীদের মতানুযায়ী কাজ করলে তখন যে ফলাফল প্রকাশ পেতো, তা আজকে তাদের সামনে নিয়ে আসাও কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়।

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে جماعت اسلامی اسکا مقصد تاریخ اور لائحہ عمل ৬২-৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

কর্মপন্থার পরিবর্তন এবং তার স্বরূপ ঃ

এভাবে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ ও উপায়-উপকরণ পরিমাপ করার পর আমরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাবীর মাধ্যমে সংগ্রামের সূচনা করি। আর এভাবেই আমাদের আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। এ পর্যায়ে আমরা যা কিছু করেছি, তার বিস্তৃত বিবরণ এবং ইতিহাস বিবৃত করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তা আমাদের সবারই সামনে রয়েছে। অবশ্য এ পর্যায়ে এসে আমরা আমাদের সাবেক কর্মপন্থায় কি পরিবর্তন সাধন করেছি, তার প্রকৃত স্বরূপ কি ছিলো এবং নতুন পরিস্থিতিতে ঐ বিশেষ ধরনের পরিবর্তন কেন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো, এসব কথা অনুধাবন করা দরকার।

দেশ-ভাগের পূর্বে আমরা যে কর্মনীতির ভিত্তিতে কাজ করছিলাম, বাস্তব প্রয়োগ-পদ্ধতির দিকটা বাদ দিলে নীতিগতভাবে তার বুনিয়াদী নক্সা দাঁড়ায় এইঃ আমাদেরকে এমন একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যা তার নিজস্ব বুনিয়াদী আদর্শ, নিজস্ব-স্বভাব প্রকৃতি, নিজস্ব নেতৃত্ব এবং আপন কর্মীদের চরিত্রের দিক দিয়ে যথার্থভাবে ইসলামী হবে। এই আন্দোলন একদিকে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও নৈতিক ভাবধারাকে ইসলামী আদর্শে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করবে, অন্যদিকে বাতিল জীবন ব্যবস্থার আদর্শিক বুনিয়াদকে চুরমার করে সত্য জীবন ব্যবস্থার ভিত্তির উপর এক নয়া ইমারত গড়ে তোলবার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন চিন্তাশীল লোক তৈরি করবে। তৃতীয়তঃ বাতিল জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে কার্যত সংগ্রাম ঘোষণা করে তাকে পিছনে হটিয়ে দিতে এবং নিজে সামনে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে সমাজের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় বাতিল জীবন পদ্ধতির চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, সত্য জীবন ব্যবস্থার জন্যে সে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং এই নয়া জীবন পদ্ধতিকে সামলানোর জন্য উপযুক্ত লোক তৈরি হতে পারে– যুগপৎ ঐ তিনপথে চলার ফলে এমনি পর্যায় এসে যায়।[১]

এই কর্মনীতি অনুসারে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের জন্যে কাম্য একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে কামিয়াব হই। সমাজের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে 'ইসলামী বিপ্লবের পথ'-এর ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মপন্থা শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

বদলানোর কাজও আমরা শুরু করেছিলাম। কিন্তু অবিভক্ত ভারতে মুসলিম সমাজের পরিবর্তনই চূড়ান্ত ব্যাপার ছিলো না, বরং অমুসলিম সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব বিস্তারে আমরা কতোটা সফলকাম হই, এর উপরই ছিলো শেষ ফলাফল নির্ভরশীল। চিন্তাশীল লোক তৈরীর জন্যে আমরা দু'পথে চেষ্টা করে থাকি ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তাদের মানসিক যোগ্যতা-প্রতিভাকে সমালোচনা ও পুনর্গঠনের পথে চালিত করা। দ্বিতীয়তঃ যারা প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করছে, তাদের ভেতর ইসলামী চিন্তাধারার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা যে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলাম, তা হচ্ছে নিজেদেরই একটি শিক্ষা ও ট্রেনিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা সফলকাম হতে পারিনি। এখন বাকী রইলো শুধু বাতিল জীবন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে, এর জন্যে তখন আমরা কোন সুযোগ পাইনি। তাই উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিলাম।

দেশ-ভাগের পর এই আদর্শিক কর্মনীতিতে প্রকৃতপক্ষে কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে আমাদের আন্দোলনের যা ভিত্তি ছিলো, ঠিক তাই রাখা হয়েছে। সমাজের মনোভঙ্গি ও নৈতিক ভাবধারা পরিবর্তন করা, পূর্বের মতোই আমাদের প্রোগ্রামের একটি আবশ্যিক অংশ হিসাবে রয়েছে। চিন্তাশীল লোক তৈরির জন্যে আমরা পূর্বে যে দুটি পন্থায় কাজ করছিলাম, সেই দু'পথেই কাজ করতে থাকি। আর বাতিল জীবন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বর্তমানে আমরা যে সংগ্রাম শুরু করেছি, তাও কোনো নতুন জিনিস নয়, বরং আগে থেকেই এটি আমাদের কর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটিকে এখন পরিবর্তন বলা যেতে পারে, তা শুধু এই যে, আমরা অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ কর্মনীতিকে কার্যকরী করার আকৃতিকে কিছুটা পরিবর্তন করে দিয়েছি মাত্র। আমরা প্রথম পরিবর্তন সাধন করেছি আমাদের আবেদনের পদ্ধতিতে। কারণ এখন আমরা এমন একটি দেশে কাজ করছি, যার সংখ্যাগুরু অধিবাসী প্রায় শতকরা ৯০ জনই মুসলমান। মুসলমানদের সাধারণ আকাঙ্ক্ষার উপরই এখনকার জীবন পদ্ধতির গঠন ও বিপর্যয় একান্তভাবে নির্ভরশীল। একথা সুস্পষ্ট যে, একটি অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে আমরা আবেদনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম, সে পদ্ধতি এখানকার উপযোগী হতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিবর্তন করেছি আমাদের কাজের পদ্ধতিতে। পূর্বে আমরা সুযোগ-সুবিধার অভাবে শুধু কতিপয় নির্দিষ্ট পন্থায়, খুব সীমাবদ্ধভাবে দাওয়াত প্রচার, জামায়াতের সম্প্রসারণ এবং সমাজ সংশোধনের কাজ করছিলাম। এখন সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এ তিনটি কাজ ব্যাপকভাবে শুরু করে দিয়েছি এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাবী ও আন্দোলনকে এর অসীলা বানিয়ে নিয়েছি। এই আন্দোলন আমাদের জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নিজেদের দাওয়াত পৌঁছানো, তাদের ভিতর থেকে হাজার হাজার লোককে সদস্য, সমর্থক, সহানুভূতিশীল ও একমনা হিসাবে জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং সমাজে ইসলামী জীবন পদ্ধতির সমর্থক ও তার জন্যে সাধারণ আগ্রহ সৃষ্টির এক বিশাল রাজপথ খুলে দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অনৈসলামী মূল্যবোধের মুকাবেলায় ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ সাধন। কিন্তু এই পরিবর্তনের অর্থ এ নয় যে, আমরা পূর্ববর্তী পন্থাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু এই দ্বিতীয় পন্থার উপরই নির্ভর করেছি। এই ব্যাপকতর প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুরনো পন্থা অনুযায়ী গঠনমূলক প্রচেষ্টাও চালিয়ে থাকি এবং এখন পর্যন্ত আমরা তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। অবশ্য দেশ-ভাগের পর আমাদেরকে যে নতুন পরিস্থিতির মুকাবেলার জন্যে এগিয়ে আসতে হয়, সীমাবদ্ধ ও শ্লথগতিসম্পন্ন ঐ গঠনমূলক প্রচেষ্টার দ্বারা তার প্রয়োজন মিটানো সম্ভবপর ছিলো না। তাছাড়া বিরাট আকারে সম্প্রসারণের যে সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, তাকে পরিত্যাগ করা এবং এরূপ সম্প্রসারণের সুফল উপেক্ষা করাও আমাদের পক্ষে সমীচীন হতো না।

আমরা তৃতীয় পরিবর্তন করেছি আমাদের সামনে এগুবার গতিতে। পূর্বেও যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমরা কাজ করেছিলাম, তাতে বাতিল জীবন পদ্ধতির কর্তৃত্ব-শক্তির সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের পর্যায় অনেক বিলম্বে আসতো আর আমাদের জামায়াতী মেশিনারীও সে পরিকল্পনা অনুসারে সংঘর্ষের ক্রমবিকাশের জন্যে তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই আমরা হঠাৎ সংগ্রামের পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করি আর এ সংগ্রামও ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ অগ্রসর হবার সংগ্রাম ছিলো না। বরং ছিলো দেশব্যাপী ও বিভিন্ন ফ্রন্ট ব্যাপ্তিলাভের সংগ্রাম। আমরা অনুমান করেছিলাম যে, জামায়াতের মেশিনারী এই আকস্মিক পরিবর্তনকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। আলহামদুলিল্লাহ্, আমাদের সে অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়নি। বস্তুতঃপক্ষে, সময়ের নাজুকতাকে

সামনে রেখে নিজের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের খাতিরে এক বিরাট বিপদকে আমরা নিছক আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করেই বরণ করে নিয়েছিলাম। এতে আমাদের অনুমান ভুল প্রমাণিত হওয়া এবং এতো বড়ো কাজের চাপে এই ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ মেশিনটি যে কোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বার পূর্ণ সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু যে খোদার উপর ভরসা করে আমরা এই বিপদকে বরণ করে নিয়েছিলাম, তিনি আমাদের কাজে সাহায্য করেন এবং তাঁরই করুণার ফলে কাজের চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্বল মেশিনটির শক্তি ও পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী একটি প্রচণ্ড আঘাত ঃ

চতুর্থ এবং বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেছি আমাদের অগ্রগতির নক্‌শায়। প্রকৃতপক্ষে একে পরিবর্তন না বলে ইজতিহাদ বলাই সমীচীন। কারণ পূর্বে আমাদের সামনে এ ধরনের কোনো পরিকল্পনাই ছিলো না।

–আর বাতিল জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সূচনা কিভাবে হবে, অতঃপর তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে কোন্ কোন্ পথ দিয়ে আমরা সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হবো এবং এই অগ্রগতির মাঝে বিরোধী শক্তিগুলোকে প্রতিরোধ ও পিছু হটানোর জন্যে আমাদের কি কি কাজ করতে হবে– এ সম্পর্কে পূর্বে কোন পরিকল্পনা করাও সম্ভবপর ছিলো না।

এ সব কিছুই ছিলো পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। এর জন্যে না পূর্বে কোন বিস্তৃত নক্‌শা তৈরী করা যেতো, আর না এমনি কোনো পরিকল্পনার ভিত্তিতে সর্বাবস্থায় কাজ করা সম্ভব ছিলো। আমরা যদি বিভাগ-পূর্বকালীন পরিস্থিতিতে বাস করতাম তো আমাদের কাজের সূচনা কিভাবে হতো এবং সংগ্রামের পরিকল্পনাই কি হতো, তা বলতে পারতাম না। অথবা যদি বিভাগোত্তর কালের ভারতের মতো পরিবেশে থাকতাম তো সংগ্রামের পর্যায় দশ বছর পরও আসতো কি না, আর আসলে তা কিভাবে শুরু হতো, তাও বলা যেতো না। কেবল মাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি দেখেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব ছিলো যে, কুফরী ও ফাসেকী জীবন পদ্ধতির স্থলে সৎ জীবন ব্যবস্থা এবং খোদাদ্রোহী নেতৃত্বের স্থলে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা যে জামায়াতটির চরম ও পরম উদ্দেশ্য এ পরিস্থিতিতে তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তাই যুগের দাবীকে উপলব্ধি করে ঠিক সময় মতোই আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, সংগ্রামের সূচনা করার জন্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীর চাইতে অধিকতর

উপযোগী আর কোনো জিনিস নেই। এই একটি মাত্র জিনিসকে সংগ্রামের উপলক্ষ বানিয়েই আমরা নিজেদের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবার পথ খুঁজে পাবার বিভিন্ন কারণে আমাদের আন্দোলনের অনুকূলে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হবার এবং নতুন পরিবেশে আমাদের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে উত্থিত তামাম সম্ভাব্য বিপদের মুকাবেলা করতে সমর্থ হই। এছাড়া আর কোনো জিনিসকে আমাদের কাজের সূচনা হিসাবে গ্রহণ করলে তা এমনি একটি প্রচণ্ড আঘাতের ন্যায় কিছুতেই কার্যকরী হতো না।

শাসনতন্ত্রের দাবী সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ভুল ধারণা ঃ

আজ দশ বছর পর এই ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী সম্পর্কে আমাদের কতিপয় পুরনো বন্ধু এই আপত্তি তুলেছেন যে, এভাবে বিপ্লবের স্বাভাবিক পন্থা ত্যাগ করে আমরা কৃত্রিম উপায়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তৈরির চেষ্টা শুরু করেছি। বস্তুতঃ বছরের পর বছর ধরে নিজেরা এই কাজে লিপ্ত থাকার পর আজ তারা এমনি এক বিস্ময়কর ব্যাখ্যা প্রদান করছেন, যা কখনো তাদের মুখে শোনা যায়নি, আর জামায়াতের মধ্যে এ ধরনের কথা শোনা যাবে কেউ কোনো দিন ধারণাও করেনি। তাদের ঐ ব্যাখ্যা অনুসারে দেশের গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) শুধু আমাদের নির্দেশিত কতিপয় ইসলামী নীতির ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করে দেবে এবং তা তৈরি হয়ে গেলেই আমাদের ঈপ্সিত ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাবে– আমাদের সমাজ পূর্বের ন্যায় জাহেলিয়াতে লিপ্ত থাকুক না কেন– এটাই ছিলো আমাদের ঐ সংগ্রামের উদ্দেশ্য। এই ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই তাঁরা বলে থাকেন যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংশোধনের জন্যে আমাদের তখনকার পদক্ষেপ ছিলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বিপ্লবের পন্থা সম্পর্কে আমাদের বিভাগ-পূর্বকালীন ব্যাখ্যার পরিপন্থী। বিপ্লবের সে পন্থা অনুযায়ী সমাজের নৈতিক ও মানসিক পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ নিয়েছি। অথচ এই পরিষদই ছিলো সমাজের ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের প্রতিনিধি।আর এই ভ্রান্ত লোকদের দ্বারা কোনো সংস্কার-সংশোধনেরও সম্ভাবনা ছিলো না। পরন্তু এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংশোধনের কোনো কাজ করতে পারবে এমন কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না।

বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দাবীর সূচনায় ধর্মহীন রাষ্ট্র-পন্থীদের তরফ থেকে অবিকল এমনি আপত্তিরই সম্মুখীন হতে হয়েছিলো আমাদের। ১৯৪৮

সালের গোড়ার দিকে যখন পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবীতে প্রথম আওয়াজ তোলা হয়, তখন ধর্মহীন রাষ্ট্র-কামীরা নানারূপ আপত্তি ও বাহানা তুলে এই দাবীকে স্তব্ধ করে দেবার প্রয়াস পায়। যেমন তারা বলতে লাগলো, এক্ষনে ইসলামী আইন জারি হয় তো লক্ষ লক্ষ মানুষের হাত কাটা যাবে; এখানে ধর্মীয় রাষ্ট্র কায়েম করলে ভারতে হিন্দুরাও তাদের ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে; এখানে যদি আমরা ধর্মীয় রাষ্ট্র করি তো দুনিয়াব্যাপী হেয় প্রতিপন্ন হবো ইত্যাদি। কিন্তু তাদের সবচাইতে জোরালো বাহানা ছিল এইঃ ভাই, পয়লা তো সমাজটা ইসলামী হোক তারপর রাষ্ট্র আপনা-আপনিই ইসলামী হয়ে যাবে। এই বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত সমাজে তোমরা কোথায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চলেছো? এ ব্যাপারে ১৯৪৮ সালের মে মাসে বেতার অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে যে আলোচনা হয়, আমি সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উক্ত আলোচনায় ধর্মহীন মতবাদের যুক্তি ছিলো এই ঃ

'যে কোন দেশের, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তার অধিবাসীদের রসম-রেওয়াজ, স্বভাব-প্রকৃতি, নৈতিক চরিত্র ও আকিদা-বিশ্বাসের উপযোগী হয়ে থাকে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিজেই কোন দর্শন বা ধর্মের উপর নিভরশীল হতে পারে না। তাকে যদি এমনি বানাবার চেষ্টা করা হয়, তবে তা হবে এক কৃত্রিম ও অস্থায়ী প্রচেষ্টা। আমরা যদি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে চাই, তবে পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে সঠিক ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে দ্বীন-ইসলামের বুনিয়াদী মূল্যবোধের সাথে পরিচিত করানো উচিত। এই মূল্যবোধ যখন মজবুত হবে এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রে ইসলামী ভাবধারা পুরোপুরি অনুপ্রবিষ্ট হবে, তখন আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আপনা-আপনি ইসলামী রূপ ধারণ করবে। আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যতোক্ষণ না ইসলামী ঐতিহ্যপূর্ণ দীপ্তির সাথে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, ততোক্ষণ আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি না। আমার মতে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ভাবধারা গ্রহণের সময় এখনও অনেক দূরে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের প্রচেষ্টার সময় এখনো আসেনি।'[১]

এটি ছিলো সবচাইতে বেশী প্রতারণামূলক ফাঁদ আর এতেই আমাদেরকে ফেলবার চেষ্টা করা হয়। ১৯৪০ সালে এদের যুক্তি ছিলো এই যে, পয়লা মুসলমানদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম হতে দাও, তারপর তাকে ইসলামী

১. ترجمان القران জুন '৪৮ সাল।

রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করো। এই যুক্তির বলে তারা যুগপৎ মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পন্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। আর যখন তাদের জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেল, তখন তারা যুক্তি দেখাল যে, বর্তমান সমাজ যেহেতু ইসলামী নয়, সেহেতু এখানে ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র চাইলে সমাজকে বদলাবার চেষ্টা করো। সমাজ বদলে গেলে রাষ্ট্রও আপনা-আপনিই বদলে যাবে। অন্যকথায় তাদের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, এই জাতীয় রাষ্ট্রটিকে তো ধর্মহীন নীতির ভিত্তিতেই সমাজের পুনর্গঠন করতে দাও।আর তোমরা এই জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে বিদেশী আধিপত্যের যুগে যেরূপ শক্তি-ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণ ছাড়াই ইসলামী সমাজ গঠনের চেষ্টা করছিলে, ঠিক তেমনিভাবেই চেষ্টা করতে থাকো। তাজ্জবের বিষয় এই যে, তখন তো ধর্মহীন ব্যবস্থার সমর্থকরা আমাদেরকে এই ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছিলো। আর আজ খোদ দ্বীনী রাষ্ট্র-ব্যবস্থারই কতিপয় সমর্থক আমাদের বলছেন যে, তোমরা কেন ঐ ফাঁদে পা দাওনি। কেন তোমরা ইসলামী শাসনতন্ত্রের এক কৃত্রিম দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছো? এখানে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ কেন তোমরা দিলে না? তোমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা তো চিন্তার বিপ্লব এবং সমাজ সংস্কারের কাজেই নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিলো। এ কাজ যখন পূর্ণ পরিণতি লাভ করতো, তখন রাষ্ট্র তো আপনা-আপনিই ইসলামী হয়ে যেতো।

এ ব্যাপারে যাবতীয় ভুল ধারণার বুনিয়াদী কারণ এই যে, এরা না প্রাক-বিভাগ ও বিভাগোত্তর কালের অবস্থা ভালোমত উপলব্ধি করতে পারছেন, আর না এই উভয় যুগে আমাদের কথা ও কাজের মূল লক্ষ্যটি কি ছিলো তা সঠিকভাবে জানেন।

দেশ-ভাগের আগে আমরা এমন একটি মুসলিম জাতির কাছে স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের পথ পেশ করেছিলাম, যার হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ছিলো না। বরং লাভের জন্যে সে কেবলমাত্র চেষ্টা শুরু করেছিলো। পরন্তু ইসলামী রাষ্ট্রকে সে আপন লক্ষ্যস্থল বলে ঘোষণা করলেও সেখানে পৌঁছতে চেয়েছিলো ভুল পথে। আমরা তাকে বাতলে দিলাম যে, ঐ লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার স্বাভাবিক পথ হচ্ছে এটি। যদি এ পথে তোমরা অগ্রসর হও তো ক্ষমতা লাভ ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা উভয়ই এক সঙ্গে সম্ভব হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে বৃক্ষের ক্রমবিকাশ ও ফল ধারণ যেমন এক সঙ্গে হয়ে থাকে। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, আমাদের সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। মুসলমানরা শুধু ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায়ই তাদের সমগ্র

শক্তি নিয়োজিত করে। ফলে আমরা মাত্র মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি সেই স্বাভাবিক পথে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য থেকে গেলাম।

দেশ-ভাগের পর আমরা এক ভিন্নরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। তা হলো এই যে, ক্ষমতাহীন কওমটিকে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের পথ দেখাতে চেয়েছিলাম, এক কৃত্রিম বিপ্লবের সাহায্যে হঠাৎ সে রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসলো। অথচ তার সামনে না ছিলো কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য আর না ছিলো সেই লক্ষ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধনের কোনো ব্যবস্থা। তাই এভাবে সহসা ক্ষমতাসীন হবার পর আপন পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা, তাতে দেশের উপায়-উপকরণ ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা ব্যবহার করা, প্রয়োজনীয় কর্মী ও কারিগর সৃষ্টির জন্যে শিক্ষা ও ট্রেনিং ব্যবস্থা করা এবং গোটা সমাজ জীবনের পুনর্বিন্যাস ও জীবনের তাবৎ বিষয়ে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই কওমটির একটি জীবনাদর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

তখন দু'রকমের সম্ভাবনা প্রায় সমানভাবে বর্তমান ছিলো। প্রথম সম্ভাবনা ছিলো এই যে, এই মুসলিম কওমটি ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পথেই এগিয়ে চলবে এবং দেশভাগের আগে যে নিকৃষ্টতম অবস্থার চিত্র এঁকে এই পথের বিপদ সম্পর্কে আমরা এই কওমটিকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, সেই অবস্থায়ই এই কৃত্রিম বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করবে। দেশের একটি শক্তিশালী দল– যার হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠিও নিবদ্ধ ছিলো, এ কওমটিকে সেই পথেই ঠেলে দেবার জন্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করছিলো এবং যে কোনো উপায়ে দ্বিতীয় সম্ভাবনার দ্বারটি অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছিলো। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি ছিলো এই যে, এ কওমটিকে ইসলামী রাষ্ট্রের পথেই চালিত করা হবে এবং এর সমাজভূমিকে ধর্মহীনতার শিকড় দৃঢ়মূল হবার পক্ষে অনুপযোগী করে দেওয়া হবে। এর জন্যে যথাযথ সময় ও সুযোগও বর্তমান ছিলো।

এই পটভূমিকে আপনারা সামনে রাখুন। তারপর ১৯৪৮ সালে আমরা ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলন শুরু করলে যারা বলতো যে আপাততঃ একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র হতে দাও, তারপর সমাজ যতোখানি ইসলামী হতে থাকবে, রাষ্ট্রও ততোখানি বনে যাবে– তাদের সেই যুক্তির কি জবাব দিয়েছিলাম, তা-ও দেখুন। এইমাত্র যে বেতার আলোচনার কথা উল্লেখ করেছি, তাতে প্রতিপক্ষের বক্তব্যের জবাবে আমি বলেছিলাম ঃ

"আপনি ঠিকই বলেছেন যে, একটি দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সে দেশের অধিবাসীদের নৈতিক-মানসিক অবস্থারই উপযোগী হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের অধিবাসীদের যদি ইসলামের প্রতি জোরদার প্রবণতা থাকে এবং ইসলামের পথে চলবার আগ্রহও তাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র কেন সেই আগ্রহ ও ঝোঁক প্রবণতার উপযোগী হবে না? পাকিস্তানকে আমরা একটি ইসলামী রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলতে চাইলে এর অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামী চেতনা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী নৈতিকতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে আপনার এ বক্তব্যটিও ঠিক। কিন্তু আপনি এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ থেকে খোদ রাষ্ট্রকে কেন দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি না। ১৫ই আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের উপর এক বিদেশী অমুসলিম শক্তি চেপেছিলো। এর ফলে আমরা ইসলামী ধারায় আপন জাতির পুনর্গঠন কার্যে রাষ্ট্র এবং তার শক্তি ও উপায়-উপকরণ থেকে কোনই সাহায্য পাইনি। বরং প্রকৃতপক্ষে তখন রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি আমাদের জোরপূর্বক বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো, আর আমরা নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামী জিন্দেগীর পুনর্গঠনের জন্যে আন্দোলন চালাচ্ছিলাম। কিন্তু ১৫ই আগস্টের রাজনৈতিক বিপ্লবের পর আমাদের সামনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, আমাদের এই জাতীয় রাষ্ট্রটি কি ইসলামী জিন্দেগীর পুনর্গঠনে একজন নির্মাতার ন্যায় অংশগ্রহণ করবে, না একজন নিরপেক্ষ লোকের ন্যায় ভূমিকা গ্রহণ করবে, অথবা অতীতের ন্যায় আমাদের রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়াই, বরং তার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামী পুনর্গঠনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে? বর্তমানে যেহেতু পাকিস্তানের ভাবী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নির্ণয়াধীন রয়েছে, সেহেতু এখানে ইসলামী জিন্দেগীর নির্মাণ বা সংগঠন হবার উপযোগী একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠুক এটাই আমরা কামনা করি। আমাদের এই কামনা পূর্ণ হলে রাষ্ট্রের ব্যাপক উপায়-উপকরণ ও শক্তি-ক্ষমতা প্রয়োগ করে পাকিস্তানের নাগরিকদের মধ্যে নৈতিক ও মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করা খুবই সহজতর হবে। অতঃপর যে অনুপাতে আমাদের সমাজ পরিবর্তিত হবে, সে অনুপাতে আমাদের রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকবে।

১৯৪৮ সালের মে মাসে লাহোর ল-কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতায় আমি এর চাইতেও বিস্তৃত জবাব প্রদান করেছিলাম। তাতে বলেছিলাম ঃ

আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই পরিবেশ অর্থাৎ ইসলামী পরিবেশ (যার উপর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন নির্ভরশীল বলে প্রচার করা

হয়) কে সৃষ্টি করবে? তারা কি এমন এক ধর্মহীন রাষ্ট্র করবে, যার কর্তৃত্বক্ষমতা রয়েছে ফিরিংগিয়াত ঘেঁষা শাসক ও নেতৃবৃন্দের হাতে নিবদ্ধ? তাদের মতলব যদি এই হয় তো এটাই হবে মানব-ইতিহাসের সবচাইতে প্রথম ও অভিনব দৃষ্টান্ত যে, এক বেদ্বীন (secular) রাষ্ট্র দ্বীনকে নিজের স্থান দখল করার জন্যে তৈরি করবে। আর যদি তাদের মতলব অন্য কিছু হয় তো ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির কাজকে কোন শক্তি এবং কি কি উপায়-উপকরণের দ্বারা করবে আর এই সময়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র তার শক্তি-ক্ষমতা ও উপকরণকে কি কাজে ব্যয় করবে, তা তাদের স্পষ্ট করে বলা উচিত। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন হোক কিংবা অনৈসলামী জীবন-পদ্ধতির, তা ক্রমিক ধারায়ই সম্পাদিত হয়ে থাকে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রমিক নীতিতে এই পুনর্গঠনের কাজ কেবল তখনই সম্পন্ন হতে পারে, যখন কোনো সংগঠক শক্তি তার সামনে একটি লক্ষ্য এবং একটি পরিকল্পনা রেখে ক্রমাগত তার জন্যে কাজ করে যাবে। এই পাকিস্তান ইসলামের নামে এবং ইসলামের জন্যেই দাবী করা হয়েছে এবং এ কারণেই আমাদের এই স্থায়ী রাষ্ট্রটি কায়েম হয়েছে। কাজেই ইসলামী জিন্দেগীর পুনর্গঠনের জন্যে আমাদের এই রাষ্ট্রটিরই সেই সংগঠক শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া এটি যখন আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্র এবং আমাদের তামাম জাতীয় উপায়-উপকরণই এর কাছে ন্যস্ত করছি, তখন পুনর্গঠন কাজের জন্যে অন্য কোথাও থেকে সংগঠন বা উপায়-উপকরণ আমদানী করার কোনোই কারণ নেই।

'একথা সত্য হলে এই পুনর্গঠনের পথে ইংরেজের পরিত্যক্ত কুফরী ভিত্তির উপর স্থাপিত এই রাষ্ট্রটিকে মুসলমান বানানোই আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত। এরপরই সত্যিকারভাবে আমাদের ভোটদাতাগণ জানতে পারবেন যে, এখন কি উদ্দেশ্যে এবং কি কাজের জন্যে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে এই যে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা এমন লোকদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে, যাঁরা ইসলাম সম্পর্কেও ভালো জ্ঞান রাখেন এবং তদনুযায়ী দেশের জীবন-পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করতেও আগ্রহশীল। আর তৃতীয় পদক্ষেপ হবে এই যে, সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের ব্যাপকতর সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে এবং তাকে কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্রের তামাম উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।[১]

১. اسلامی قانون ৩৬-৩৯ পৃষ্ঠা

পাকিস্তানের জাতীয় রাষ্ট্র একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত হলে তার পরিণতি কি হবে, ঐ সময়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় মাওলানা আমীন আহসান সাহেবও তা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করেন। তিনি বলেন ঃ

'ধর্মের সাথে একটি ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে দু'রকমের আচরণই প্রত্যাশা করা যেতে পারে ঃ হয় সে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করবে নতুবা দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, ধর্মহীন রাষ্ট্র এই দুটি নীতি দুটি ভিন্ন রকমের পরিবেশে গ্রহণ করে থাকে। যেসব দেশে ধর্মীয় চেতনা দুর্বল, ধর্মহীন রাষ্ট্র সেখানে সাধারণতঃ উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করে থাকে এবং প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থার চাপে এই ভীরু ধর্মীয় চেতনার যাতে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং তাকে মারবার জন্যে কোনো অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন না হয় কেবল এটুকুই সে লক্ষ্য রাখে। কিন্তু যেখানে ধর্মীয় চেতনা জাতিগত, ধর্মীয় সংস্থা শক্তিশালী এবং ধর্মের শিকড় উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত এ মাটিতে তার শিকড় পুরোপুরি প্রসারিত হতে পারে না বলে ধর্মহীন রাষ্ট্র উপলব্ধি করে, সেখানে সে ধর্মের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার জন্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করে থাকে। পাকিস্তানের অবস্থা ঠিক তেমনি ধরনের বলেই আমার ধারণা। এই কারণেই এদেশের ধর্মহীন নেতৃবৃন্দও এখান থেকে তামাম ধর্মীয় নাম-নিশানা মুছে ফেলতে বাধ্য হবে।'[১]

এই ব্যাখ্যা থেকে আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন যে, দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যে যে পরিবেশে আমরা ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীকে কাজের সূচনা হিসাবে নির্বাচিত করেছিলাম, তাতে সামনে এগোবার এটিই ছিলো একমাত্র নির্ভুল পথ। বস্তুতঃ স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের পন্থা একটি বাঁধাধরা পদ্ধতি এবং সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় তাকে একইভাবে কার্যকরী করা উচিত, এটা সম্পূর্ণ একটি অযৌক্তিক ধারণা। প্রাকবিভাগ কালে আমরা যে পদ্ধতিতে কাজ করতাম, একটি সদ্য আজাদীপ্রাপ্ত মুসলিম জাতির ভিতর বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তা আদৌ স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত পথ ছিলো না, বরং সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে তার আজাদী ও স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের সুষ্ঠু ব্যবহারের পথ বাতলানো, অন্যান্য বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের প্রভাব থেকে তাকে রক্ষা করা, তার দেশে কোনো ভ্রান্ত ও ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়া এবং তার এই নতুন শক্তি-ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণকে একটি সৎ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করার চেষ্টা করাই

১. آزادی کے اسلامی تقاضے ২৬-২৭ পৃষ্ঠা।

ছিলো নির্ভুল পথ। আমরা যদি উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতাম এবং আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এক বেদ্বীন নেতৃত্ব এখানে দৃঢ়মূল হয়ে জাতির উপর একটি নিরেট ধর্মহীন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে পারতো, কেবল তখনই আমাদের পক্ষে প্রাক-বিভাগকালীন কর্মপন্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হতো।

আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, আমাদের এই আন্দোলন শুধু শাসকদের দ্বারা ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরি করিয়ে নেবার দাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো এবং তার ভিতর সমাজ গঠনের কোনো উপাদান বর্তমান ছিলো না, তবে তা চিন্তার দৈন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে গত দশ বছরের মধ্যে অসৎ ও দুষ্কৃতকারী নেতৃত্বের মুকাবেলায় সৎ-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে আমরা সমাজকে কতোখানি তৈরি করেছি এবং নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক থেকে ইসলাম-বিরোধী তৎপরতার প্রতিরোধ ও ইসলাম সমর্থক তৎপরতার বিস্তৃতি সাধনে কতোটা খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি, তা একটু চোখ মেলে তাকালেই তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে শাসক শ্রেণীর লোকেরা মোটেই আমাদের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো না, তার লক্ষ্য ছিলো এদেশের আপামর জনসাধারণ। পরন্তু ধর্মহীনতার যে তুফান আপনাদেরই চোখের সামনে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে এই দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চেয়েছিলো, ইসলামী জীবন পদ্ধতির সমর্থনে ঐ জনমত সংগঠন করেই আমরা তার মুকাবেলা করেছি। বস্তুতঃ জনমত গঠনে আমাদের এই সাফল্যের ফলেই ধর্মহীন শক্তি তার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ও উপায়-উপাদান সত্ত্বেও এখানে পাকাপাকি শাসন ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি, বরং শাসক-শক্তির সমস্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও ইসলামী জীবন পদ্ধতির সপক্ষে প্রতিরক্ষা ও অগ্রগতির ক্ষমতাসম্পন্ন এক সুসংবদ্ধ শক্তির সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে, যার সঙ্গে জীবনের সকল দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই সম্পৃক্ত রয়েছেন। এটাও যদি সমাজ-সংগঠনের পদবাচ্য না হয় তো এ ধরনের মতবাদ পোষণকারীরা সমাজ সংগঠন বলতে আর কি বুঝাতে চান এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী কোন্ বস্তুটাকে সমাজ-সংগঠন বলা যায় আর কোনটাকে বলা যায় না, মেহেরবানী করে আমাদেরকে তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়ার জন্যে তাদেরকে অনুরোধ করছি।

সমাজের উপর আমাদের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব ঃ

আমি জামায়াতে ইসলামীর কৃতিত্বের হিসাব-নিকাশ করাকে হামেশাই অপছন্দ করি, বরং কর্মীদের মধ্যে অধিকতর মেহনত ও কর্মোদ্যম সৃষ্টির জন্যে আমি নিজেদের ক্রটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতাকে তাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবারই পক্ষপাতী। নিজেদের কৃতিত্বকে গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করা এবং কর্মীদের মধ্যে আত্মশ্লাঘার মনোভাব সৃষ্টিকে আমি হামেশাই নিরুৎসাহ করি। কিন্তু তবু এমনি ধরনের এক বিতর্কেরই আমি সম্মুখীন হয়েছি। কারণ আজকে জামায়াতের সমস্ত কৃতিত্বকেই অস্বীকার করা হচ্ছে এবং এই অস্বীকৃতি শুধু অস্বীকৃতির জন্যেই নয়, বরং এ দ্বারা আমাদের বিভাগ-পরবর্তীকালের তামাম প্রয়াস-প্রচেষ্টাকেই ভ্রান্ত বলে যুক্তি দেখানো হচ্ছে। পরন্তু আমাদের এযাবতকালের সমস্ত কর্মফলকে পণ্ডশ্রম আখ্যা দিয়ে প্রাকবিভাগকালীন পরিস্থিতির দিকে উল্টো লাফ দেবার যুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাই এই নয়া নীতি অনুসারে গত দশ বছরে আমরা যা কিছু করেছি, তা বাধ্য হয়েই আমাকে পেশ করতে হচ্ছে।

দেশ-ভাগকালে জামায়াতের মোট সদস্য-সংখ্যা ছিলো ৩৮৫। আর আজকের[১] সংখ্যা হচ্ছে ১২৭২। কতো বিপুলসংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছার এবং তাদেরকে কতোখানি প্রভাবান্বিত করার পর এই বাড়তি ৯০০ লোককে আমরা এই জামায়াতে সদস্য হিসাবে কাজ করার জন্যে পেয়েছি, এর সদস্য-গ্রহণের পদ্ধতি দেখলেই তা আন্দাজ করা যেতে পারে।

তখন মুত্তাফিকের (প্রাথমিক কর্মী) সংখ্যা হাজার-বারো শ'র বেশী ছিলো না। আজকের সংখ্যা হচ্ছে ২৫ হাজারের কাছাকাছি।[২] কতো লাখ মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পর ২৫হাজার লোক যথারীতি মুত্তাফিক হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, মুত্তাফিক-সংগ্রহের পদ্ধতি সামনে রেখে আপনারা নিজেরাই তা অনুমান করতে পারেন। প্রভাবিত লোকদের (মুতায়াস্‌সির) সংখ্যা আজ লক্ষাধিক পর্যন্ত পৌঁছেছে। সমাজের এমন কোনো শ্রেণী নেই, যার ভিতর কম বেশী এমন লোক পাওয়া যায় না। সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, উকিল, ছাত্র-শিক্ষক, অধ্যাপক, কৃষক-শ্রমিক, শহুরে, গ্রামবাসী– মোটকথা জীবনের কোনো দিক ও বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরাই আজ এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। পরন্তু এদের ভিতরে এক বিপুলসংখ্যক লোক শুধু জামায়াতের উদ্দেশ্য এবং তার কাজের প্রতিই গভীরভাবে আসক্ত নন, বরং তার নৈতিক প্রভাবও গ্রহণ করছেন।

---

১. এ সংখ্যা মাছিগোঠ সম্মেলন কালের। বর্তমান সংখ্যা চৌদ্দশ'র কাছাকাছি।

২. বর্তমানে (১৯৫৭) এ সংখ্যা ৩০ হাজারের উর্ধে উঠেছে।

গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এই আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং এখনো করছে, আগে গ্রামাঞ্চল এর প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত ছিলো। আজ সেখানে মজবুত ভিত্তির উপর মুত্তাফিক সংগঠন কায়েম হচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে এই প্রথমবার এতো ব্যাপকভাবে লোকদেরকে ইসলামী জীবন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার সাথে পরিচিত করানো হলো। এ বিষয়ে ইত:পূর্বে এদেশের জনসাধারণকে এতো বিপুলভাবে শিক্ষা দেবার আর কোনো দৃষ্টান্তই খুঁজে পাওয়া যায় না। আর না দুনিয়ার অন্য কোনো মুসলিম দেশে এর কোনো নজীর পাওয়া যায়। বরং জনসাধারণ্যে শাসনতন্ত্র বিষয়ক চেতনা সৃষ্টির এতো ব্যাপকতর প্রচেষ্টা তো পাশ্চাত্য দেশেও কদাচিৎ করা হয়েছে।

বিদগ্ধ মহলে আমাদের আন্দোলন কতোখানি প্রভাবশীল হয়েছে তা এখেকেই আন্দাজ করা চলে যে, ইসলামের রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, রাজনৈতিক মতবাদ, অর্থনীতি, আইন-শাস্ত্র এবং জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের বই-পুস্তকে যে বিশেষ ধারা পেশ করা হয়েছে, এতদসম্পর্কে গত কয়েক বছরের বেশীর ভাগ আলোচনা ঠিক সেই ধারায়ই করা হয়েছে।[১] আজ এমন কোনো জ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মুকাবেলায় ইসলামী চিন্তাধারার সমর্থক বর্তমান নেই এবং চিন্তার জগতে এক সংঘাতের সূচনা হয়নি।

দেশ ভাগকালে পূর্ব পাকিস্তান এই আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ছিলো। কিন্তু এই দশ বছরের প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফলে তা এতোখানি তৈরি হয়েছে যে, সেখানে কম্যুনিজম ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের মুকাবেলা করার শক্তি আজ একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনেরই রয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে ইসলামী জীবন পদ্ধতির সপক্ষে জনমত কতোখানি সংগঠিত করা হয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিপুল পরিমাণ উপায়-উপকরণ সত্ত্বেও অনৈসলামী ভাবধারার সমর্থক ও ধারক-বাহক শক্তিগুলো কতোটা পিছু হটেছে এবং ইসলামী ভাবধারার পোষকশক্তিগুলো কতোদূর সামনে অগ্রসর হয়েছে, শাসনতন্ত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ স্বীকার করিয়ে নেয়াই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যারা

১. পনেরো-বিশ বছর আগে এই সকল বিষয়ে শুধু আমাদের দেশে নয় বরং অন্যান্য মুসলিম দেশেও যা কিছু লেখা হয়েছে, পরবর্তী কালের রচনাবলী ও পুস্তকাদির সাথে তার তুলনা করলে এতদসম্পর্কে পণ্ডিত ও লেখকদের ধারণা আগের চাইতে কতোখানি সুস্পষ্ট এবং জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারার সঙ্গে তার--- তা সহজেই বোঝা যায়।

এটাকে তুচ্ছ প্রমাণ করার জন্যে বলে থাকেন যে, এ দুটি বিপরীতমুখী ভাবধারার শক্তি পরীক্ষার ফল নয়, বরং একটি ভুয়ো সান্ত্বনা মাত্র কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর দর কষাকষি থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতির এক আকস্মিক ফল মাত্র, অথবা কতিপয় রাজনৈতিক নেতার নিজস্ব ধর্মীয় মনোভঙ্গির ফল মাত্র– তারা প্রকৃতপক্ষে ভাবাবেগের আতিশয্যে সত্যের অপলাপ করেন। এই বিষয়টি নিয়ে গোটা নয় বছর যাবত সারাদেশে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অব্যাহত ছিলো এবং সেক্যুলারিস্ট শক্তিগুলো যেভাবে শাসনতন্ত্রে ইসলামী মুলনীতি সন্নিবেশ করানোর ব্যাপারে পদে পদে বাধাদান করেছিলো, তার ইতিহাস এতো বেশী পুরানো নয় যে, আজ কোনো হটকারী ব্যক্তির দু'চারটে উক্তি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। সেক্যুলারিজমের তুফান বারবার কিভাবে ইসলামী ভাবধারাকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামী ভাবধারা কিভাবে জনমতের সহায়তায় তার অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, এ ইতিহাসের প্রতিটি অনুচ্ছেদই তার সাক্ষী। আমি বুঝি না, শাসনতন্ত্র রচনার শেষ পর্যায়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণী ও স্তরের লোকেরা যে অভূতপূর্ব ঐক্যের সঙ্গে ইসলামী ধারাসমূহের সন্নিবেশের ব্যাপারে জোরদার সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং শাসনতন্ত্র রচনাকারীদেরকে এই 'কন্টক' গলাধঃকরণে– যাঁরা এর চাইতে বিষপান করতেই বেশী পছন্দ করছিলেন– বাধ্য করেন, তাকে কোন প্রগলভ ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে! সারা দুনিয়ার মুসলিম দেশসমূহে আমাদের আন্দোলন বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের পুস্তকাদি শুধু তাদের চিন্তাধারার উপরই প্রভাব বিস্তার করেনি, তাদের আন্দোলনগুলোকেও কার্যত প্রভাবিত করেছে। এমনিভাবে সদ্য আজাদীপ্রাপ্ত মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবীকে জোরদার করে তুলেছে।

আমি শুধু জানতে চাই যে, এটা বাস্তব ঘটনা কি না। এটা যদি বাস্তব ঘটনাই হয় এবং এর সত্যতাকে অস্বীকার করা না চলে, তবে এ কাজটিকে 'সমাজ সংগঠন' পদবাচ্য বলা যায় কি না? মাত্র ৩৮৫ জন লোকের প্রাথমিক শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করে দশ বছরের মধ্যেই এতো কঠিন বিরোধী শক্তির মুকাবেলায় আর কোন পন্থায় আপনারা এতোখানি কাজ করতে পারতেন? আর প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি এতো ব্যাপকভাবে কাজ না করা হতো, তাহলে আপনাদের অবস্থা কি তুরস্কের চাইতে– যেখানে ত্রিশ বছর পর আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষাদানের অনুমতিপ্রাপ্তি এবং কিছু ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশের স্বীকৃতি লাভকে গনীমত মনে করা হচ্ছে– বেশী কিছু উন্নত হতো?

সপ্তম ধারা

এরপর আমি প্রস্তাবনার সপ্তম ধারার উপর আলোকপাত করতে চাই। এতে বলা হয়েছে যে, গত দশ বছরের প্রয়াস থেকে যে ফলাফল লাভ করা গেছে, তারপর কর্মসূচীর কোন অংশকে নাকচ, মুলতবী বা নিষ্ক্রিয় করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এমনি ধরনের দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পর শাসনতন্ত্রে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে মুলনীতি স্বীকার করিয়ে নেয়া হয়েছে তাকে দেশের ব্যবস্থাপনায় কার্যত চালু করাই হচ্ছে এখন আসল কাজ। আর এই প্রবর্তনা নেতৃত্বের পরিবর্তনের উপরই নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ে একটি সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পন্থা এই হতে পারে যে, এই কর্মসূচীর চারটি অংশেই আমাদের যুগপৎ কাজ করতে হবে এবং চারটি ক্ষেত্রেই ভারসাম্যের সাথে কাজ করতে করতে এমনিভাবে আমাদের সামনে এগুতে হবে যে, চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন, সৎ ব্যক্তিদের সংগঠন এবং সমাজ সংশোধনের কাজ যতোটা হতে থাকবে, সেই অনুপাতেই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামপন্থী লোকদের প্রবেশ ও প্রভাবও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামপন্থী লোকদের প্রবেশ ও প্রভাব যতোটা বাড়তে থাকবে চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন, সৎ ব্যক্তিদের সংগঠন এবং সমাজ সংশোধনের কাজও ততোখানি বেশী শক্তির সঙ্গে আঞ্জাম দিতে হবে। এ পর্যায়ে কর্মসূচীর কোন অংশকে নাকচ করা তো দূরের কথা মুলতবী করাও কল্পনাতীত ব্যাপার।

আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যে গোড়াতেই আমি একথা স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই যে, জামায়াতের কোন একটি লোকও এই কর্মসূচীর পয়লা তিনটি অংশের কোন একটিকে নাকচ, নিষ্ক্রিয় বা মুলতবী করার মত পোষণ করে না। সুতরাং এ সম্পর্কে আলোচনা করারও কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য জামায়াতের কেউ কেউ এর চতুর্থ অংশটিকে (নেতৃত্বের পরিবর্তন) দীর্ঘকালের জন্যে মুলতবী রেখে শুধু পয়লা তিনটি অংশে কাজ করারই পক্ষপাতী। বরং কখনো কখনো এঁদের কারো কারো আলোচনার ধরন থেকে তা এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে, এঁদের দৃষ্টিতে এই চতুর্থ অংশে কাজ করার আদৌ কোন প্রয়োজনই নেই। শুধু পয়লা তিনটি অংশে কাজ করেই সমাজকে এমনিভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে করে একটি স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গিটির যাচাই-পর্যালোচনার উপরই আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখা উচিত। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গিটি কতোখানি যুক্তিসংগত

এবং এই পর্যায়ে আমাদের কর্মসূচীর রাজনৈতিক অংশকে নাকচ, মুলতবী বা নিষ্ক্রিয় করে দেবার ফল কি হবে, তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের মতবাদ ঃ

এ সম্পর্কে আমার পয়লা কথা এই যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন এবং নেতৃত্বের বেলায় আপনা-আপনি বিপ্লব সৃষ্টির এই আজব মতবাদটি একেবারেই আমার বোধশক্তির অগম্য। বিষয়টি যদি আকস্মিক ঘটনার হয় তবে মানুষ প্রতিটি দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকেই স্বীকার করে নিতে পারে। কিন্তু ব্যাপার যেখানে ঈপ্সিত ফল লাভের, সেখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার জন্যে চেষ্টা না করা এবং সেই বিশেষ ফলাফলের জন্যে বিবেকবুদ্ধি, স্বভাব-প্রকৃতি ও দুনিয়াবী অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার না করা পর্যন্ত আপনা-আপনি কোন ঈপ্সিত ফল প্রকাশ পাওয়া আমার এই নগণ্য বুদ্ধিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। আপনারা যদি কোন কেল্লা জয় করতে চান তো কেল্লা বিধ্বংসী অস্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা, জনমনে কেল্লা জয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা ইত্যাদি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এই সব প্রাথমিক উপকরণ সংগৃহীত হয়ে গেলেই কেল্লাটি আপনা-আপনি বিজিত হবে অথবা তা যাদের অধিকারে রয়েছে, তারা নিজেরাই এসে আপনাদের হাতে তার চাবি তুলে দিয়ে যাবে বলে মনে করা নেহাত কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, কেল্লা ঠিক তখনই বিজিত হবে, যখন তা জয় করার জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণ আপনারা কার্যত ব্যবহার করবেন, তাকে জয় করার জন্যে জনমনে সৃষ্ট আগ্রহ-উদ্দীপনা ঠিক জয়ের পথেই নিয়োজিত হবে, কেল্লার সামনে জড়ো করা অস্ত্রপাতি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কেল্লা জয়েরই কাজ করা হবে, সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার উপর হামলা চালানো হবে এবং কেল্লাবাসীদের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করা হবে। এসব কাজ যদি আদপেই আপনাদের পরিকল্পনায় না থাকে, বরং দুনিয়াবাসী পূর্বাহ্নেই জানতে পারে যে, নিছক 'প্রস্তুতি এবং আগ্রহ' সৃষ্টির চাইতে বেশী কিছু করার অভিপ্রায় কিংবা কেল্লার উপর আক্রমণ চালানোরও কোন প্রোগ্রাম আপনাদের নেই, তবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেল্লা ছেড়ে পলায়ন করার মতো সরলমনা শত্রু আপনারা কোথায় পাবেন, আমি বুঝি না। বরং আমার জানা মতে, এই অর্থহীন প্রস্তুতির কাজে বুঝে-শুনে আপনাদের সহায়তা করবে এবং আপনাদের প্রচেষ্টায় কেল্লা জয়ের ব্যাপারে এতটুকু আগ্রহান্বিত হবে, এমনি সাদাসিধা কোন মানব-গোষ্ঠী দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কারো কারো মনে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, দেশ-ভাগের আগে জামায়াতে ইসলামীর কাছে এই স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের কোন নকশা বর্তমান ছিলো এবং দেশ-ভাগের পর জামায়াত তা গোপন করে ফেলেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা যে জিনিসটাকে এ ধরনের নকশা বলে মনে করছেন, বাতিল জীবন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দুষ্কৃতকারী নেতৃত্বকে অপসারণ করার আন্দোলনের অংশ পুরোপুরিই বর্তমান ছিলো। এই অংশটি ছাড়া নকশার অন্যান্য অংশ ব্যবহার করলেও বাতিল জীবন-পদ্ধতি আপনা-আপনি জায়গা ছেড়ে দিবে এবং তার পরিচালক ও নেতৃত্ব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরে দাঁড়াবে– এমনি কোনো মতবাদের চিহ্নই তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কর্মসূচীর রাজনৈতিক অংশ নিষ্ক্রিয় করার পদ্ধতি ঃ

এই মতবাদটিকে আলোচনাবহির্ভূত করার পর সবচাইতে বেশী বিবেচনাযোগ্য প্রস্তাব হলো, কোন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কর্মসূচীর রাজনৈতিক অংশ অর্থাৎ নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে সরাসরি আন্দোলনকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা করার আগে এর সম্ভাব্য পরিণতি এবং আদপেই এর কোন প্রয়োজন আছে কিনা, তা আমাদের খুব ভালোমতো তলিয়ে দেখা দরকার।

আমার মতে, এর প্রথম পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, দেশের যেসব লোক জামায়াতে ইসলামীর কাছ থেকে সংস্কার-সংশোধনের কিছুমাত্র আশা পোষণ করে, এই সিদ্ধান্তের কথা শুনেই তারা হঠাৎ নিরাশ হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক ময়দান থেকে পিছপা হবার পর এটি তাদের দৃষ্টিতে নিছক তাবলীগী ধরনের একটি জামায়াত বৈ আর কিছুই থাকবে না। আর যে জামায়াত লোকদেরকে শুধু সংশোধনের ওয়াজই শুনিয়ে বেড়ায় কিন্তু তাদের বাস্তব সমস্যাবলী পর্যালোচনা বা তার সমাধানের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না, জনসাধারণ বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কারো কাছেই তা এতোটুকু মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়। কাজেই আমি মনে করি, এই কাজটিকে আপনারা যতোদিনের জন্যে মুলতবী রাখবেন, ততোদিন লোকেরাও মনোযোগের সাথে আপনাদের কথা শোনা মুলতবী রেখে দিবে। বরং আপনাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের মনে এ ধারণারও সৃষ্টি হতে পারে যে, এ একটি পাগলাটে জামায়াত, কখনো এর উপর কোনো ঝোঁক দেখা দিলেই হঠাৎ ময়দান থেকে কেটে পড়ে। এমতবস্থায় আর কোনদিন জনগণের আস্থা অর্জন করাও আপনাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

এই সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, খোদ জামায়াতের বিপুলসংখ্যক রুকন ও মুত্তাফিক বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে। আমার ধারণায় এই ধরনের সিদ্ধান্ত শুধু একটি বিশেষ প্রকৃতির শতকরা দু-তিনজন লোককেই সন্তুষ্ট করতে পারে, বাকী যে বিপুল সংখ্যক লোক হক ও বাতিলের এই সংগ্রামকে চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত পৌছানোর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, তাদেরকে বীতশ্রদ্ধার হাত থেকে কোনো মতেই রক্ষা করা যাবে না।[১]

এর তৃতীয় পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, দেশে ইসলামী ফ্রন্ট অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে। এই ফ্রন্টে মোট কয়টি এবং কোন কোন ধরনের শক্তি বর্তমান রয়েছে, তাদের চিন্তা ও বোধশক্তি, শৃংখলা ও সংগঠন যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা, সংকল্প ও দৃঢ়তার অবস্থা কিরূপ এবং তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর স্থান কোথায়, তা কারোই অজানা নয়। এমতাবস্থায় এ জামায়াতটি রাজনৈতিক ময়দানে বর্তমান নেতৃত্বের পথ থেকে সরে দাঁড়ালে সামগ্রিকভাবে ইসলামপন্থী এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির মধ্যকার ভারসাম্যের উপর কি তীব্র প্রভাব পড়তে পারে এটা আন্দাজ করতে খুব বেশী চিন্তাশক্তির প্রয়োজন হয় না।

এর চতুর্থ পরিণতিটা তৃতীয় পরিণতির সঙ্গে অংগাংগিভাবে জড়িত। তা হচ্ছে এই যে, এর ফলে ইসলাম-বিরোধী শক্তি দ্রুত সাহস সঞ্চয় করে ফেলবে। আপনারা জানেন যে, এ যাবতকালের প্রচেষ্টায় তাদেরকে কিছুটা পিছু হটানো হয়েছে মাত্র, পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। কারণ রাষ্ট্রীয় যন্ত্র তাদেরই করায়ত্ত, পত্রিকা ও প্রচারণার প্রায় তাবত উপায়-উপকরণ তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্তমান, ভোটদাতাদেরকে ধোকা, প্রতারণা ও দুর্নীতির বলে অপব্যবহার করতে এবং প্রলোভনের দ্বারা খরিদ করে নিতে তারা পুরোপুরি সমর্থ। পরন্তু একটি নয়া ইসলাম উদ্ভাবনের জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাকে যারা উৎসাহিত করে চলছে এবং যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের ইসলামী অংশে একটি চোরা-দরজাও জুড়ে দিয়েছে। এক দীর্ঘ সংগ্রামের পর শাসনতন্ত্রে ইসলামী উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যা কিছু ভালো জিনিস সন্নিবেশিত হয়েছে, তার কার্যকারিতা এখন নেতৃবৃন্দের নীতি-নিষ্ঠা, আইন

১. মাছিগোঠ সম্মেলনে জামায়াত-সদস্যদের চূড়ান্ত ফায়সালাই এ ধারণাকে একেবারে নির্ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। গোটা সম্মেলনে এই বিশেষ মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক শতকরা দু'জনও পাওয়া যায়নি। বাকী ৯৮ ভাগেরও বেশীসংখ্যক লোক আলোচ্য প্রস্তাবনার সপক্ষে মত প্রকাশ করে। মুত্তাফিকদের মধ্যেও প্রায় এমনি তুলনামূলক হারই পাওয়া যায়।

কমিশনের সঠিকভাবে কার্যনির্বাহ এবং ধর্মহীন শক্তির একচেটিয়া সুযোগের পথ রুদ্ধ করার মত লোকদের অন্তত পার্লামেন্ট ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার উপরই নির্ভর করে। আর এই তিনটি কাজের জন্যেই কঠিন প্রয়াস-প্রচেষ্টা এবং বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর ক্রমাগত চাপ দানের প্রয়োজন। যদি জামায়াতে ইসলামী এই ময়দান থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ইসলামী ফ্রন্ট কমজোর হয়ে পড়ে তো এতোদিনকার সমস্ত কাজই নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং শাসনতন্ত্রের ইসলামী অংশও নিছক কাগজের টুকরায় পরিণত হবে। এমনকি সেটুকু একেবারে উলংগ চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে এবং জামায়াতের প্রতি জনসাধারণের নির্লিপ্ততা দেখে এ প্রতিষ্ঠানটি যাতে আর কোনদিন নিজের পরিত্যক্ত মর্যাদায় ফিরে যেতে না পারে, তার জন্যে সম্ভাব্য তামাম উপায়ে চেষ্টা করবে। তখন যদি জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অনুকূলে কোন আন্দোলন গড়ে তুলে এ পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে চায়ও, তবু তাতে সফলকাম হওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, জনসাধারণের সামনে নিজেদের চিন্তাশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির এই নমুনা পেশ করার পর আবার আমরা তাদের কাছে আবেদন জানাতে যাবো কোন্ মুখে।

তাছাড়া আমি যতোটা চিন্তা করে দেখেছি আজ পর্যন্ত এর কারণ ও প্রয়োজনটা আমার বোধগম্যই হয়নি। দাওয়াত, তাবলীগ ও সমাজ সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে যদি অনৈসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পোষক শক্তিগুলোকে পিছু হটিয়ে শাসন-ক্ষমতায় ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমর্থক শক্তিকে অভিষিক্ত করার চেষ্টাই না হয়, তবে ঐ কাজগুলো দ্বারা কি লাভটা হবে? এমনি প্রচেষ্টা না চালানোর ফায়দা কি, আর চালানোরই বা লোকসানটা কি? পরন্তু নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ময়দানে অবতরণের পূর্বে আপনারা সমাজ-সংশোধনের কি পরিমাণ কাজকে শর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট করবেন এবং কোন্ মাপকাঠি দ্বারা সেই পরিমাণটা যাচাই করে দেখবেন, তাও আমি বুঝতে পারি না।

রাজনৈতিক অংশকে নিষ্ক্রিয় করার কারণ ও প্রমাণগুলো পর্যালোচনা ঃ

আমার জানা মতে কতিপয় লোকের মনে কর্মসূচীর রাজনৈতিক অংশকে নিষ্ক্রিয় বা মুলতবী করে দেবার এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে মাত্র তিনটি কারণে। এই কারণগুলো এ ধরনের কোন প্রস্তাবের পক্ষে কতোখানি যুক্তিসংগত, তাও আপনাদের ভালোমতো যাচাই করে দেখা দরকার।

পয়লা কারণ ঃ

এর পয়লা এবং সবচাইতে বড়ো বরং আসল কারণ হচ্ছে এই যে, উল্লিখিত লোকদের মতে জামায়াতের দ্বীনী ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটেছে, এই জন্যে পয়লা রাজনৈতিক আন্দোলন বাদ দিয়ে কর্মীদের নৈতিক মান উন্নত করা এবং তারপরে রাজনীতিতে ফিরে আসা উচিত। বিভিন্ন সময় এই কারণটির কথা আমি নিজেও শুনতে পেয়েছি।

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, সামগ্রিকভাবে গোটা জামায়াত যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে তো তাকে ভেঙ্গে দিন। কারণ আমরা বিকৃতিকে সংশোধন করার জন্যেই সংঘবদ্ধ হয়েছি– বিভ্রান্ত দলগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে নয়। কিন্তু গোটা জামায়াত সম্পর্কে এই ব্যাপক ও সাধারণ ফায়সালা যদি অতিশয়োক্তি হয় এবং জামায়াতের মধ্যে মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নৈতিক মানেই অবনতি ঘটে থাকে, তবে তাদের কারণে গোটা কাফেলার পথচলা ব্যাহত করা এবং তারা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত অগ্রগতির প্রোগ্রাম মুলতবী রাখা তার সত্যিকার কোন প্রতিকার হতে পারে না। বরং এর সঠিক প্রতিকার হচ্ছে এই যে, জামায়াতের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের অকেজো লোকদের হয় সংশোধন করুন, নতুবা জামায়াত থেকে তাদের বহিষ্কার করে দিন, কিন্তু কাফেলার অগ্রগতির পথে এক মুহূর্তের জন্যেও বাধার সৃষ্টি করা সংগত হবে না। জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস আপনাদের সামনে রয়েছে। যারা এ জামায়াতে একবার যোগদান করেছেন, তারা নীতিনিষ্ঠ থাকুন আর নাই থাকুন, যে কোন অবস্থায়ই তাদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে এবং অকেজো লোকদেরকে বহিষ্কার করার পরিবর্তে জামায়াত তার নিজের প্রোগ্রাম বদলে ফেলবে– এমনি পন্থায় সে কবে কাজ করছিলো? সে তো তার কর্মীদের মধ্যে সদস্য-পদের জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মানটুকু বজায় রাখা এবং হামেশা তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখার জন্যে জন্ম মুহূর্ত থেকেই সমালোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদের নীতি অবলম্বন করে এসেছে। এই নীতি অনুযায়ী কারো ভিতরে নীতি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেলে তার সহকর্মীগণ তাকে সংশোধন করতে এবং সংশোধিত না হলে তাকে জামায়াত থেকে বিদায় করে দিতে পারেন। বস্তুতঃ এই নীতি অনুসারে শুরু থেকে জামায়াতে যে ধারায় সদস্য গ্রহণ করা হচ্ছে, সেই ধারায়ই তাদের বহিষ্কার করার কাজও অব্যাহত রয়েছে। এমনকি, ১৯৪৪-৪৫ সালে মাত্র এক বছরের

মধ্যেই তিনশ' সদস্যকে জামায়াত থেকে বের করে দেয়া হয়।[১] এই নীতি আজও আপনাদের জামায়াতে বর্তমান রয়েছে। এই নীতি অনুসারে দ্বীনী ও নৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে, এমনি ধরনের লোকদের থেকে আপনারা জামায়াতকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন। এধরনের লোক আজ আপনাদের মধ্যে থেকে থাকলে তার কারণ হচ্ছে এই যে, আপনারা জামায়াতের এই প্রচলিত নীতি অনুযায়ী কাজ করতে শৈথিল্য দেখিয়েছেন। এখন সেই নীতিকে পুনর্জীবিত করা এবং তাকে সঠিকভাবে কার্যকরী করার পরিবর্তে উল্টা ঐ লোকগুলোকে জামায়াতের মধ্যে আঁকড়ে রাখার খাতিরে আপনারা তার উদ্দেশ্যের পক্ষে অপরিহার্য প্রোগ্রামকেই রদবদল করার প্রস্তাব আনছেন। কি আশ্চর্য কথা।

আমি তবু বলবো যে, জামায়াতের কতিপয় লোকের দ্বীনী ও নৈতিক মানের অবনতির কারণে যদি তার কর্মসূচীর রাজনৈতিক অংশকে মুলতবী করা অপরিহার্য হয়, তবে দাওয়াত, তাবলীগ, সমাজ-সংশোধন ও জামায়াত সম্প্রসারণের কাজকে মুলতবী রাখা তার চাইতেও বেশী অপরিহার্য। কারণ বিকৃত দ্বীনী ও নৈতিক অবস্থা নিয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানো কিভাবে সম্ভব হতে পারে? সমাজের সংশোধন করার কি অর্থ থাকতে পারে? আর সৎ ব্যক্তিদের সন্ধান অনুসারে তো শুধু বর্তমান সদস্যদের ট্রেনিং ও সংশোধন পর্যন্তই জামায়াতের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, যে পর্যন্ত তামাম সদস্য পুরোপুরি আদর্শ সদস্যে পরিণত না হবে, সে পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে তার কোনো দাওয়াতী বা সংশোধনমূলক বা রাজনৈতিক কাজ করতে পারবে না। সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও নেয়া উচিত যে, সদস্যদের অবস্থা পর্যালোচনার পর যখনই জানা যাবে যে, ট্রেনিং ও সংশোধনের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বীনী ও নৈতিক দিক দিয়ে জামায়াতের মধ্যে কিছু এমনি মানের লোক রয়ে গেছে, তখন সমস্ত প্রোগ্রাম মুলতবী করে দিয়ে জামায়াতকে আবার ট্রেনিং কেন্দ্রের দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর এই জামায়াত আর কখনো কোনো বৃহত্তর কাজ সম্পাদন করতে পারবে কি না, এ প্রশ্নকেই আপনারা আলোচনা বহির্ভূত করে দিতে পারেন। কারণ আমার জানা মতে ঈপ্সিত মানের লোক তৈরীর ব্যাপারে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চয়তা দানকারী কোন পন্থাই আজ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি, এর জন্যে আপনারা যতো খুশী চেষ্টা

---

১. رو داد جماعت তৃতীয় খণ্ড ১৩-১৪ পৃষ্ঠা। প্রকাশ থাকে যে, ঐ বছরের প্রথম দিকে সদস্যদের মোট সংখ্যা ছিলো সাড়ে সাত শ' অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন সদস্যকে অকেজো বিবেচিত হওয়ায় জামায়াত থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়।

করে দেখতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক বারের পর্যালোচনায়ই আপনারা দেখতে পাবেন যে, আপনাদের মধ্যে একটি নিম্নমানের জনসমষ্টি বর্তমান রয়েছে। বরং বলা যায়, সামগ্রিকভাবে গোটা জামায়াত সম্পর্কেও সকল দিক দিয়ে পূর্ণ সন্তোষজনক রিপোর্ট হয়ত আপনারা কখনোই পাবেন না। এখন আপনারা যদি একেবারে এই সিদ্ধান্ত করে নেন যে, এই ধরনের পর্যালোচনার ফলে হামেশাই আপনাদের প্রোগ্রাম মুলতবী করতে হবে, তবে আমার মতে এরপর জীবন-ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টির পরিকল্পনা মুছে ফেলে দিয়ে হুজরা বা খানকা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে চিন্তা করাই হবে আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এমনিতরো অবস্থায় আপনারা সমাজ জীবনে কখনো কোন ফলপ্রসূ কাজ করতে পারবেন না।

এ হচ্ছে ঐ চিন্তাধারার একটি দুর্বল দিক। দ্বিতীয় দিকটি এর চাইতেও বেশী দুর্বল। তা হলো এই যে, নৈতিক চরিত্র গঠন ও দক্ষ কর্মী তৈরীর যে ধারণা এই প্রস্তাবের মূলে কাজ করছে, তা মূলতঃই গলদ। পরন্তু নৈতিক চরিত্র গঠনের যে ভুল ধারণার সংশোধনের জন্যে আমরা বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করে আসছি, তা আমাদেরই চৌহদ্দীর মধ্যে কি করে স্থান পেলো, এটা আমার পক্ষে শুধু দুশ্চিন্তার কারণই নয়, নিতান্ত উদ্বেগজনক ব্যাপারও। কারণ জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পয়লা কর্মীদের নৈতিক-চরিত্র গঠন এবং তারপরে এই ক্ষেত্রে ফিরে আসতে বলার ভিতর দিয়ে চরিত্র-গঠন সম্পর্কে এই ধারণাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, একটি কাজের জন্যে যে ধরনের নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজন, সে কাজে অংশগ্রহণ না করে তা বাইরে থেকেও তৈরী করে আনা যেতে পারে, অথচ পানিতে না নেমে সাঁতার কাটার ধারণার মতোই এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমাদের বিবেক-বুদ্ধি একে গলদ বলবে। অভিজ্ঞতা একে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে। আমাদের দিবা-রাত্রির পর্যবেক্ষণ থেকে এ ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, যে কাজের জন্যে যে ধরনের চরিত্রের প্রয়োজন, তা সেই কাজে অংশগ্রহণ করলেই গঠিত হতে পারে। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে যেরূপ চরিত্র আবশ্যক, তা এই কাজের দ্বারাই গঠিত হবে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে যে রকম চরিত্রের দরকার, তা দোকান-পাট ও কেনা-বেচার মাধ্যমেই তৈরী হবে। এ ব্যাপারে 'হুজরা' ও খানকায় বসে যদি আপনারা দশ বছর ধরেও অনুশীলন করেন, তবু দাওয়াত ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পা বাড়াতেই আপনারা অনুভব করবেন যে, এখানে আপনাদের সামনে যেসব পরীক্ষা রয়েছে, তার মুকাবেলায় নৈতিক দিক দিয়ে

আপনাদের স্থান একেবারেই প্রাথমিক স্তরে। রাজনীতি ও নির্বাচনের ব্যাপারটাও এইরূপ। এ কাজগুলোর নৈতিক অসুবিধা এবং এতে অংশগ্রহণের বিপদ ও অনিষ্টগুলো দেখে এথেকে আপনারা চিরতরে সরে পড়বার সিদ্ধান্ত করতে চান তো করুন। কিন্তু আপনারা এই ময়দানে ফিরে আসবারই এরাদা করবেন, অথচ এই কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় চরিত্র গঠনের অজুহাতে কয়েক বছরের জন্যে দূরে সরে থাকবেন, এটা নিছক খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি আপনাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আপনারা এই ময়দান থেকে বাইরে কোথাও গিয়ে প্রস্তুতি চালাতে থাকুন। অতঃপর যখন এখানে ফিরে আসবেন, তখন নিজেদের অবস্থা আজকের চাইতে কিছুমাত্র উন্নত পাবেন না। কারণ এখানে যে নৈতিক শক্তির প্রয়োজন তা বাইরে কোথায়ও গিয়ে তৈরি করে আনা যেতে পারে না। তা এই ময়দানে শয়তানী শক্তির সঙ্গে ক্রমাগত শক্তি-পরীক্ষা করেই বিকশিত হতে পারে। এর ক্রমবিকাশের একমাত্র উপায় হচ্ছে ঃ আপনারা নিজেদের কর্মীদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং একটি নৈতিক বিধানসহ রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মমুখর ক্ষেত্রে নিয়ে আসুন। অতঃপর কঠিনতম নাজুক পরিস্থিতিতেও সেই লক্ষ্য ও নৈতিক আদর্শের উপর তাদেরকে অবিচল রাখার চেষ্টা করুন। নির্বাচনী লড়াইকালে যেসব পার্টি নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততার যাবতীয় নীতিকে বিসর্জন দিয়ে শুধু জয়লাভ করার জন্যেই চেষ্টানুবর্তী হয়, সেই সব পার্টির মুকাবেলা করার জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন এবং নির্বাচনী যুদ্ধের চরম হট্টগোলের মধ্যেও আপনাদের কর্মীরা যাতে নৈতিকতার কোন বিধান এবং বিশ্বস্ততার কোন সীমালংঘন না করে, তার প্রতি কড়াকড়ি নজর রাখুন। এই পরীক্ষাকালে যাদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাবে, তাদেরকে পাকড়াও করুন। যারা সংশোধনযোগ্য, তাদের সংশোধনের চেষ্টা করুন এবং পরবর্তী পরীক্ষাকালে তাদের আচরণ লক্ষ্য করুন। আর যাদের অবস্থা সংশোধনের অযোগ্য বলে মনে হবে, তাদেরকে বাইরে নিক্ষেপ করুন। এই বাস্তব ট্রেনিং একমাত্র এমনি ট্রেনিং কেন্দ্রেই দেয়া যেতে পারে। বাইরে আর কোথায় আপনারা এই ট্রেনিং দেবেন। আর এ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে কিনা, তাই-বা আপনারা কিভাবে জানতে পারবেন?

আপনাদের সামনে আজকে এই যে কর্মনীতি পেশ করা হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে এটি নতুন কিছু নয়। বরং ১৯৫১ সালের নির্বাচনে সে এই নীতিটি প্রয়োগ করেও দেখেছে এবং ইতঃপূর্বে এর ফলাফলও আপনারা খুব

ভালোমতো পর্যালোচনা করে দেখেছেন। উক্ত নির্বাচনের অব্যবহিত পরই আপনাদের মজলিসে শূরা জামায়াতের নির্বাচনী প্রয়াস সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রস্তাবাকারে যে সমালোচনা করেছিলো তার নিম্নোক্ত অংশ দ্রষ্টব্য ঃ

'এই নির্বাচনী প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সতেরো শ' লোক আমাদের কর্মীদের সংগে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছে। তারা কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ বা প্রলোভন ছাড়াই আমাদের কর্মীদের উপর আরোপিত তামাম নৈতিক বিধি-নিষেধের আওতায় থেকেই পুরোপুরি জীবনপণ করে কাজ করেছে।'

পাঞ্জাবের এতোবড়ো বিস্তীর্ণ এলাকায় জামায়াতের মাত্র তিন চার হাজার কর্মী নির্বাচনী প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেছে এবং এতে করে তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীদের চরম অনৈতিকতা ও উচ্ছৃংখলতার মুকাবেলা করতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ভোটাভুটির চরম উত্তেজনাকালেও জামায়াতের কর্মীগণ সামগ্রিকভাবে নৈতিক পবিত্রতা এবং আইন ও শৃখংলার প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে এমন অতুলনীয় নমুনা পেশ করেছে যে, সরকারী কর্মচারী ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর কর্মীরা পর্যন্ত তার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। নির্বাচনের সমগ্র কার্যাবলী পর্যালোচনা করে জানা গেছে যে, দু'চারটি কেন্দ্র ছাড়া পাঞ্জাবের কোথাও জামায়াতের কর্মীগণ কোন নৈতিক কমজোরী বা আইন ও শৃংখলা ভংগের পরিচয় দেয়নি। আর ঐ দু'চারটি কেন্দ্রেও জামায়াতের কর্মীগণ সামগ্রিকভাবে তাতে লিপ্ত হয়নি, বরং কতিপয় একক ও স্বতন্ত্র কর্মীই– এবং তাদেরও বেশীর ভাগ নতুন– তাতে লিপ্ত হয়।'

'এর যে দিকটি আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে সন্তোষজনক তা হলো এই যে, এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েতী প্রতিনিধিদের পক্ষে কার্যরত মহিলা কর্মীগণ সর্বত্রই শরয়ী' পর্দার বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন করেছেন। অথচ এক-আধটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছাড়া মহিলাদের ভোট গ্রহণকালে সরকার, রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ পর্দার বিধি-বিধানের কিছুমাত্র পরোয়া করেছেন, গোটা পাঞ্জাবে এমন কোন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রই ছিলো না। জামায়াতের কর্মীগণ এই প্রথমবার নির্বাচনী ময়দানে অবতরণ করেন। বেশীর ভাগ কর্মীরই নির্বাচন সম্পর্কে পূর্বেকার কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। আর বর্তমান গণতন্ত্রের ইতিহাসে নৈতিক বিধিনিষেধ এবং আইন ও শৃংখলার আনুগত্যের সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিজ্ঞতা সম্ভবত এই-ই প্রথম ছিলো।'[১]

---

১. روداد مجلس شوری এপ্রিল, ১৯৫১ (৭-১০ পৃষ্ঠা)

'ভবিষ্যতে প্রত্যেক নির্বাচনকালে শুধু জামায়াতের কর্মীদেরই নয়, বরং জামায়াতের সপক্ষে কাজ করতে আগ্রহশীল লোকদেরকেও একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে, জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে কোন আসন দখল করার চাইতে নির্বাচনকে অনৈতিকতা ও উচ্ছৃংখলতার নাপাকী থেকে মুক্ত করা এবং নির্বাচনী লড়াইয়ে নৈতিক বিধি-নিষেধ এবং আইন ও শৃংখলার প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য প্রদর্শনকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। কেননা রাজনীতিকে সততা ও বিশ্বস্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত করা জামায়াতে ইসলামীর বুনিয়াদী উদ্দেশ্যের অন্যতম। এই উদ্দেশ্যকে আমরা কোন সাময়িক স্বার্থের বিনিময়েই কোরবান করতে প্রস্তুত নই। এই কারণে মজলিসে শূরা এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে যে, ভবিষ্যতে যেসব জামায়াত সদস্য নির্বাচনী লড়াইয়ে নৈতিকতা ও আইন-শৃঙ্খলা ভংগ করবে, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা যাবে না। আর জামায়াতের বাইরের যেসব লোক এই ধরনের কাজে লিপ্ত হবে, ভবিষ্যতে তাদের সহায়তা গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানাতে হবে।

এ হচ্ছে এমন এক ট্রেনিং-পদ্ধতি, যা আপনারাই প্রথমবার প্রয়োগ করে দেখেছেন। আর আপনাদের মজলিসে শূরার সতেরো জন সদস্য গোটা নির্বাচনী কার্যাবলী পর্যালোচনা করে যথারীতি প্রস্তাব আকারে তার এই ফলাফল প্রকাশ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এই ফলাফল কি এতোখানি হতাশা ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক যে, তা দেখে আপনারা এটিকে ব্যর্থ পদ্ধতি বলে আখ্যা দান করতে পারেন? আপনারা কি রাজনীতি এবং নির্বাচনী যুদ্ধে অবতরণের জন্যে এই শর্ত আরোপ করতে চান যে, তিন-চার হাজার লোককে ময়দানে নিয়ে এলে তাদের ভিতর যেনো একটি লোকও নিম্নমানের না থাকে? এই ময়দান থেকে বাইরে বসে লোক তৈরি করবে এবং তাদেরকে ময়দানে নিয়ে এলে বাস্তব পরীক্ষায় হাজারে একটি লোকও অকেজো সাব্যস্ত হবে না বলে নিশ্চয়তা দিবে, এমন আর কোন পদ্ধতি আপনারা নির্দেশ করতে চান?

এই চিন্তাধারার আরো একটি কমজোর দিক রয়েছে এবং সে দিকটিও কোনক্রমে উপেক্ষা করা চলে না। যারা বর্তমানে রাজনৈতিক ময়দান থেকে সরে গিয়ে কয়েক বছর চরিত্র গঠনে ব্যয় করে পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে এখানে ফিরে আসতে বলেন, তাঁরা সম্ভবত ধারণা করে নিয়েছেন যে, আমরা শূন্য ময়দানে কাজ করছি এবং এখান থেকে যখন খুশী সরে যাওয়া ও যখন খুশী সাবেক জায়গায় ফিরে আসাও বুঝি খুব সহজ। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, গত দশ

বছর ধরে আমরা কঠিন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আপন লক্ষ্যপানে এগোবার চেষ্টা করছি, বিভিন্নমুখী শক্তির সঙ্গে পায়ে পায়ে সংগ্রাম করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে পিছু হটিয়ে এগিয়ে যাবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বস্তুতঃ এটা এমন কোনো শূন্য ময়দান নয় যে, এখানে আমরা ধীর পদবিক্ষেপে, মন্থর গতিতে এসেছি আর দূরে সরে গেলেও আবার ধীর পদবিক্ষেপেই ফিরে আসতে পারবো। এটা তো প্রতিযোগিতা আর সংগ্রামের ক্ষেত্র, এখানে এক পা পিছু হটলেও হারানো জায়গায় ফিরে আসা মোটেই সহজ কাজ নয়। এই কারণেই শুধু কল্পনার কয়েকটি তরংগাভিঘাতে প্রবাহিত হয়ে তাড়াহুড়া করে এখান থেকে পিছু হটবার সিদ্ধান্ত করা যায় না। এমনি কোন ফায়সালা করার আগে প্রথমতঃ রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করার ফলে আমাদের আন্দোলনের কি বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল, যার মুকাবেলা ইসলাম-বিরোধী ও নৈতিকতা বিধ্বংসী শক্তিগুলোর জন্যে গোটা ময়দান ছেড়ে দেয়া অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি বলে বিবেচিত হতে পারে এবং সে ক্ষতিটুকু স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হতে পারে, তা আমাদের জানা দরকার। দ্বিতীয়তঃ এখান থেকে সরে যাবার পর আবার এখানে ফিরে আসতে পারবো কিনা তা-ও আমাদের স্পষ্টভাবে সামনে থাকা দরকার। কারণ চরিত্র গঠনের জন্যে যে কয়টি বছর আমরা ব্যয় করবো, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে না, বরং এই কয় বছরই তারা নিজেদের শিকড় সুদৃঢ় করতে এবং আপনাদের প্রত্যাগমনের পথ বন্ধ করে দিতে ব্যয় করবে। তারা দেশের ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে। কাজেই যতোক্ষণ পর্যন্ত এই দুটি প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া যাবে ততোক্ষণ রাজনৈতিক ময়দান থেকে পিছু হটবার কোন প্রস্তাবই আমাদের বিবেচনাযোগ্য হতে পারে না– কেবলমাত্র আমাদের সামনে জামায়াতের নৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটবার একটি কাল্পনিক আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে– যা প্রকৃত ঘটনার দিক দিয়েও নেহাত অতিশয়োক্তিমূলক বলেই তাকে চোখ বুঁজে মেনে নেয়া যায় না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ

এই প্রস্তাবের পক্ষে দ্বিতীয় এই কারণটি পেশ করা হয় যে, আমাদের কাছে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ইসলামী ধারায় চালিত করার মতো যোগ্য লোক তৈরি নেই। এমতবস্থায় শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যদি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোন

পরিবর্তন সূচিত হয়ও, তবু ইসলামী নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পুনর্গঠন ও পরিচালনা করতে সক্ষম লোক আমরা কোত্থেকে খুঁজে আনবো? এই কারণেই প্রথমতঃ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্যে উপযুক্ত সংগঠক ও পরিচালকের একটি বাহিনী তৈরির পন্থা যেমন আমাদের সময়োচিত হবে, তেমনি তা ফলপ্রসূও হবে।

এই যুক্তিধারা স্বতঃই প্রমাণ করে যে, এই সমগ্র বিষয়টিই অত্যন্ত হালকাভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর পিছনে নিছক কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা করে নিয়েছে যে, এখানে শুধু নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনই পরিচালনা হচ্ছে, এর সংগে মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক পরিবর্তন সৃষ্টিকারী কোন আন্দোলন নেই। তারা এও ধারণা করে নিয়েছেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে নেতৃত্বের পরিবর্তন একেবারে আকস্মিকভাবে সূচিত হবে এবং যুগপৎ এই বাস্তব প্রশ্নও আমাদের সামনে দেখা দিবে যে, নেতৃত্বের চাবিকাঠি তো ইসলামী রাষ্ট্রকামীদের হাতে এসে গেছে, এখন একে পুনর্গঠিত করার উপযোগী লোক কোত্থেকে আনা যাবে। এর সাথে তারা তৃতীয় আর একটি জিনিস ধারণা করে নিয়েছে যে, জীবন পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্যে কোথাও কোন আন্দোলনকে কাজ করতে হলে প্রথমে কোথাও আলাদা বসে নিজের ঈপ্সিত ব্যবস্থার জন্যে লোক তৈরি করা দরকার এবং যখন বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করার জন্যে পরিচালক, চিন্তাবিদ, সিপাহসালার এবং অন্যান্য ধরনের বিশেষজ্ঞ যথেষ্ট সংখ্যক তৈরি হয়ে যাবে, কেবল তখনই রাষ্ট্রব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে তার এগিয়ে আসা উচিত। বস্তুতঃ এই তিনটি ধারণা সঠিক না হলে এর ভিত্তিতে গড়া যুক্তিধারাও সঠিক হতে পারে না। আমি মনে করি, যে কোন ব্যক্তি একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই এই ধারণা তিনটিকে ভ্রান্ত বলে উপলব্ধি করতে পারবেন।

প্রকৃতপক্ষে আকস্মিক পরিবর্তন গোপন চক্রান্তমূলক আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেও খুব কমই সূচিত হয়ে থাকে– গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সূচিত হওয়া তো দূরের কথা। কারণ, জীবন পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্যে আদর্শ ও মতবাদের ভিত্তিতে এবং গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যেসব আন্দোলন কাজ করে, তাদের প্রতিটি পরিবর্তনই ধাপে-ধাপে ও পর্যায়ক্রমে সূচিত হয় এবং তাদের সামনে এ প্রশ্ন কখনো যুগপৎ দেখা দেয় না যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো বদলে গেছে, কিন্তু একে পরিচালনা করার মতো লোক পাবে কোথায়। বরং

বাস্তবক্ষেত্রে বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীতই হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঠিক তখনই পরিবর্তিত হয়, যখন জনসাধারণের এক বিরাট অংশের মতামত, চিন্তাধারা, মানসিকতা এবং ভালো-মন্দের মাপকাঠিতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। আর এই পরিবর্তন স্বতঃই এ কথার নিশ্চয়তা দেয় যে, জনসাধারণ এই পরিবর্তনকে কবুল করেছে, নয়া ব্যবস্থা পরিচালনা করার মতো লোক তাদের মধ্য থেকেই সংগৃহীত হবে।

এই পরিবর্তন সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আন্দোলন যখন জীবনের গুরুতর সমস্যা ও বিষয়াদিতে অংশগ্রহণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দোলন ও শক্তিগুলোর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করতে বিলম্ব করে, তখন পরিবর্তনের গতিও খুব মন্থর হয়ে থাকে। কেননা এমনি পরিস্থিতিতে খুব কম লোকই একে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর চিন্তাধারা ও গঠনমূলক প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে। কিন্তু যখন সে নিজের আদর্শ ও মতবাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বাস্তব সমস্যায় সাগ্রহে অংশগ্রহণ করে, সে সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তি-প্রমাণসহ পেশ করে, পরন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর চিন্তা ও কর্মধারার যুক্তিভিত্তিক সমালোচনা করে এবং কার্যত তার মুকাবেলায় সংগ্রাম শুরু করে দেয়, তখন জনসাধারণের বিপুল অংশ স্বতঃই তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। আর তার সমালোচনা, গঠনমূলক চিন্তা ও স্বভাব-চরিত্র যদি প্রাণবন্ত হয় তো জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে কর্মরত লোকেরা তার সমর্থক হতে থাকবে। বিশেষত সংগ্রাম যখন জীবনের কোন বাস্তব সমস্যা নিয়ে শুরু হয়, তখন আপনারা যা ভাবতে চান তার মধ্যে কি অনিষ্ট রয়েছে, আর যা গড়তে চান তারই বা স্বরূপ কি এবং কোন্ কোন্ নীতি ও আদর্শের উপর তা প্রতিষ্ঠিত তা বিরাট বিরাট গ্রন্থ ছাড়া নিজেই লোকদেরকে বুঝিয়ে দেয়। যারা সমাজে বসবাস করে, তাদের প্রত্যেকের মনেই এ সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা গড়ে ওঠে। আর সংগ্রামের পরিসর যতো বৃদ্ধি পেতে থাকে, লোকেরা ততোই তার দ্বারা প্রভাবিত হতে এবং আপন আপন যোগ্যতানুযায়ী পরিবর্তন কবুল করতে থাকে।

তাই এই ধরনের কোন আন্দোলনের পক্ষে কখনো বাইর থেকে লোক তৈরি করে আনবার প্রয়োজন হয় না। সে নিজের আদর্শ প্রচার ও চেষ্টা-সাধনার বলেই সমাজের তৈরি লোকদের দীক্ষিত (Convert) করে নিজের সমর্থক ও মতাবলম্বী বানিয়ে নেয়। তার এই প্রচার ও চেষ্টা-সাধনা যেহেতু কোন নির্জন স্থানে বসে হয় না, বরং এই সমাজের মধ্যেই হয়ে থাকে, এজন্যই এর বিস্তৃত প্রভাবে জীবনের

কোন দিক ও বিভাগের লোকই কম-বেশী প্রভাবিত না হয়ে পারে না। পরে যখন আন্দোলনের ক্রমোন্নতির ফলে এক পর্যায়ে নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধিত হয়, তখন এই প্রভাবান্বিত লোকেরাই কার্যোপযোগী হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া কোনো ব্যবস্থাপনাকে চালিত করার উপযোগী লোক বাইরে থেকে তৈরি করে আনা যেতে পারে, এধারণাটাই গলদ। এটা কোন কারখানায় ঢালাই করা কিংবা কোন ল্যাবরেটরীতে তৈরি করার জিনিস নয়। এ ধরনের লোক বহুদিনের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব কাজের মধ্যেই তৈরি হয়ে থাকে। দেশের জন্য উন্নত মানের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক,পরিকল্পনাবিদ ও প্রস্তুতকারক সংস্থা কায়েম করার মতো উপকরণ আপনারা কোত্থেকে সংগ্রহ করবেন, এ প্রশ্ন আপাততঃ মুলতবী রাখুন। একে সম্ভবপর মনে করলেও এ প্রশ্নটি বাকিই থেকে যায় যে, ঐ সংস্থাগুলোতে শিক্ষা ও ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকেরা কি প্রথম পদক্ষেপেই প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হবে?

পরন্তু আমাদের এই দেশ যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত হচ্ছে, তাতে জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হলে এই গণতান্ত্রিক সরকারের গোটা মেশিনারী সম্পর্কে আমাদের এক বিপুল সংখ্যক সদস্য ও মুত্তাফিকের বাস্তব জ্ঞানলাভ করা এবং এর কার্যাবলী পরিচালনার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। এই জ্ঞান ও দক্ষতা বাইরের কোথাও থেকে নিয়ে আসা সম্ভবপর নয়, বরং এ কাজে সরাসরি লিপ্ত হয়েই তা অর্জন করা যেতে পারে। নির্বাচনী কাজের জন্যে অভিজ্ঞ লোক নির্বাচনের মাধ্যমেই তৈরী হবে, দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান পার্লামেন্টে গিয়েই সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্রের আইন পরিষদে গিয়ে আপনাদের কর্মীরা যখন সরাসরি দেশ শাসন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর মুখোমুখি হবার সুযোগ পাবেন, তখন সরকারের বিভিন্ন বিভাগে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সৃষ্টি হবে। এই কাজকে আপনারা যতোদিন খুশী মুলতবী রেখে দিতে পারেন। কিন্তু যখন এদিকে ফিরে আসবেন একেবারে বিসমিল্লাহ্ থেকেই আপনাদের কাজ শুরু করতে হবে। সমস্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতা আপনারা বাইরের কোথাও থেকে তৈরি করে নিয়ে আসবেন, আর এসেই সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, এটা কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না।

এরপর আর একটি ধারণা বাকী থেকে যায়। তাহলো এই যে, এখানে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের সাহায্যেই নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে, এর পাশাপাশি নৈতিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের জন্যে কোন প্রচেষ্টা

চলছে না। এ সম্পর্কে আমি শুধু এটুকুই বলবো যে, যে দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে এই যুক্তিধারা গ্রহণ করা হয়েছে, ভিত্তিহীন কথার উপর যুক্তির ইমারত গড়ে তোলাই হচ্ছে তার দুর্বলতার প্রথম লক্ষণ। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এমন কে একথা ইনসাফের সঙ্গে বলতে পারেন যে, আজ পর্যন্ত আমরা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করছি? আর কে-ইবা আমাদের আলোচ্য চার দফা কর্মসূচী থেকে এ অর্থ নির্গত করতে পারেন যে, ভবিষ্যতের জন্যে আমরা এম্নি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করছি? আমাদের তো গোটা পরিকল্পনাই হচ্ছে একদিকে নৈতিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা, অন্যদিকে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে রাজনৈতিক ময়দানে ধর্মহীন শক্তিগুলোর– যারা আজকে ক্ষমতার চাবিকাঠি করায়ত্ত করে রেখেছে কিংবা ভবিষ্যতে করতে ইচ্ছুক– তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই পরিকল্পনা আমরা এ জন্যেই গ্রহণ করছি যে, এভাবে যে ক্রমিক ধারায় নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধিত হবে, সেই হারেই নয়। ব্যবস্থাপনা করার উপযোগী লোক তৈরি ও সংগৃহীত হতে থাকবে। এখন কেউ যদি এই পরিকল্পনা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশটুকু বাদ দিতে চান, তবে তার মতে যে কর্মী গোষ্ঠীর তৈরি ও সংগ্রহ রাজনৈতিক কাজ শুরু করার জন্য প্রধান শর্ত হওয়া উচিত, তা তিনি কোথায় এবং কিভাবে তৈরি করবেন, তা তার সোজাসুজি বলে দেয়া উচিত। এই সোজা পথ ছেড়ে নেহাত একটি অমূলক ধারণার আশ্রয় নেয়া কিছুতেই সংগত হতে পারে না।

তৃতীয় কারণ ঃ

আলোচ্য প্রস্তাবের সপক্ষে আর একটি অমূলক কারণ পেশ করা হয় তাহলো এই যে, এ পর্যন্ত জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ ও উন্নতমানের কোনো কাজই আমরা করিনি। আর আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের পরিবর্তন ছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তন যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি নয় লাভজনক। এই কারণেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের খেয়াল ছেড়ে আমাদের সমগ্র শক্তিকে জ্ঞান-গবেষণার কাজে নিয়োজিত করা উচিত। এইভাবে আমরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় বুনিয়াদ তথা বর্তমান ধর্মহীন সভ্যতার ভিত্তিভূমিকে ধসিয়ে দিতে এবং তার বদলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব-রূপায়ণের মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাধারার নয়া বুনিয়াদ স্থাপন করতে পারবো, তখন স্বভাবতঃই একটি বিপ্লবের সৃষ্টি হয়ে রাজনীতিসহ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের নেতৃত্বকেই পরিবর্তিত করে দিবে।

প্রকৃতপক্ষে এ একটি ভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা। একে গ্রহণ করতে আপনাদের এই কর্মসূচী থেকে শুধু চতুর্থ অংশটিই বাদ দিলে চলবে না। বরং বাকী তিনটি অংশও নাকচ করে দিতে হবে। কারণ, এই পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে তো সাধারণ দাওয়াত, সৎ ব্যক্তিদের সংগঠন এবং সমাজ সংশোধনের কাজও অসময়োচিত এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, গত পনেরো-বিশ বছরে আমরা আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে যা করেছি,তা সবই ছিলো বাহুল্য এবং নিছক নির্বুদ্ধিতার কারণেই আমরা ভ্রান্তপথে পা বাড়িয়েছিলাম। এর পরিবর্তে আমাদের যা করা উচিত ছিলো এবং এখনো করা উচিত, তা হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা, সমালোচনা ও নব-রূপায়ণের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা। অতঃপর এই একাডেমী কর্মফল থেকে আমরা যখন একটি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার মতো উপকরণ লাভ করবো, তখন তার ভিত্তি স্থাপনের জন্যে আমাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ করা উচিত। এরপরে যা কিছু করতে হবে, তা এখনই চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। কারণ ৬০/৭০ বছরের কাজের জন্যে আমাদের এই প্রোগ্রামই যথেষ্ট! এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, একটি জীবন পদ্ধতির আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে অন্য একটি জীবন পদ্ধতির জন্যে এমনি বিপ্লবাত্মক ও গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান কোথায় এবং কি কি উপকরণ দিয়ে স্থাপিত হবে, প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থার সর্বাত্মক প্রাধান্য তাকে কতোটা কাজ করার সুযোগ দিবে এবং তার (প্রতিষ্ঠিত জীবন পদ্ধতির) ব্যাপক সুদূরপ্রসারী আদর্শিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক প্রভাব ইতিমধ্যে কি পরিমাণে নিজের কাজ করে নেবে? বস্তুতঃ যে কল্পনার জগতে বসে এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে চিন্তা করা হয়েছে, এসব প্রশ্ন সেখানে আদৌ দেখা দেয় না।

প্রকৃতপক্ষে এ একটি স্থূল ও অগভীর ধারণা মাত্র, ভালো মতো বুঝবার চেষ্টা না করে এবং চিন্তা-ভাবনা করার কোন শ্রম স্বীকার না করেই নেহাত অপরিপক্ক অবস্থায় একে পেশ করা হয়েছে। এই ধারণার মধ্যে কোথায় কি ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে এবং এতে যে প্রয়োজনটির কথা উল্লিখিত হয়েছে আমাদের আন্দোলনে তা আগে থেকেই কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনার মাধ্যমে তা আমি বিবৃত করতে চাই।

এতে ধারণা করা হয়েছে যে, কোন জীবনদর্শন অনুযায়ী প্রথমতঃ চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টি করাই হচ্ছে তদনুযায়ী রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টির একমাত্র পথ। অথচ এমনটি হওয়া মোটেই অপরিহার্য নয়। আমাদের এই দেশেই ইংরেজরা এসে

প্রথমে শুধু রাজনৈতিক পন্থায়ই শাসন-ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর এই দেশেরই উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের জীবন দর্শন অনুযায়ী লোকদের চিন্তাধারা, নৈতিক-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, তাহজীব ও তমদ্দুন ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসকে বদলে দেয়। এই সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ছিলো রাজনৈতিক বিপ্লবের পরিণতি মাত্র– তার কারণ নয়। খোদ ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) শুরুতে ইসলামী চিন্তা পদ্ধতির অনুগামী একটি মুষ্টিমেয় জামায়াত গঠন করেন। অতঃপর নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের সংগে সংগে রাজনৈতিক বিপ্লব এমনি পাশাপাশি চলতে থাকে যে, উভয় বিপ্লব একই সংগে পূর্ণত্ব লাভ করে। সেখানে এই উভয় ধরনের আন্দোলনকে আমরা একে অপরের এমনি সহায়ক হিসেবে দেখতে পাই যে, রাজনৈতিক বিপ্লব কি নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের পরিণতি, না বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিপ্লব রাজনৈতিক বিপ্লবের পরিণতি– আমাদের পক্ষে এটা মীমাংসা করাই কঠিন ব্যাপার। কাজেই রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্যে চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টি করা একটি অপরিহার্য প্রধান শর্ত, একথা চূড়ান্তরূপে বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্রধান শর্ত বলা যায় একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারার অনুগামী এবং তার বাস্তবায়নের যোগ্যতাসম্পন্ন একটি সংঘবদ্ধদলের অস্তিত্বকে। তেমনি একটি দল যখন গড়ে উঠবে, তখন সে আপন লক্ষ্যপানে কোন পথে অগ্রসর হবে, তা নির্ভর করে সম্পূর্ণতঃ অবস্থা ও সুযোগ-সুবিধার উপর। যদি রাজনৈতিক পরিবর্তন তখন সম্ভবপর হয় তো শুধু একটি কাল্পনিক মতবাদের ভিত্তিতে সেই সম্ভাবনা থেকে ফায়দা হাছিল করতে বিরত থাকার কোনই কারণ নেই। এমনি পরিস্থিতিতে সে রাষ্ট্রক্ষমতা ও যাবতীয় উপায়-উপকরণ করায়ত্ত করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির দিকে গোটা জীবন পদ্ধতিরই মোড় ঘুরিয়ে নিতে পারে, এদেশে এসে ইংরেজরা এটা বিরাট সাফল্যের সংগে করে দেখিয়েছে। নবীদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবন কাহিনীতেও এমনি কর্মনীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে সে চিন্তার বিপ্লব ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে একসংগে চেষ্টা করতে পারে; অর্থাৎ চিন্তা ও আদর্শের দাওয়াত প্রচারের ফলে যতটা শক্তি অর্জিত হবে, তাকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহার করবে আর রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা যতোখানি শক্তি অর্জিত হবে, তা দ্বারা চিন্তার বিপ্লবকে অধিকতর ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী করে তোলার চেষ্টা করতে থাকবে। হিজরাতের পর নবী করীম (সাঃ) এই কর্মপন্থাই গ্রহণ করেছিলেন।

এই খেয়ালী পরিকল্পনায় দ্বিতীয় যে ভ্রান্ত ধারণাটি স্থান পেয়েছে তা হলো এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও নব-রূপায়ণের উদ্দেশ্যে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে আমাদের নিজস্ব জীবন দর্শন অনুযায়ী একটি পূর্ণাংগ ও বিস্তৃত চিন্তা-পদ্ধতি তৈরি করা এবং তারপর নিজস্ব দর্শন অনুযায়ী কায়েম করে ঐ চিন্তা-পদ্ধতি অনুযায়ী মানসিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত এক বিপুলসংখ্যক লোক তৈরি করাই হচ্ছে আদর্শিক বিপ্লব সৃষ্টির একমাত্র পথ। অথচ এই উদ্দেশ্য হাসিলের এটাই একমাত্র পথ নয়। এর একটি অন্যতম পথ হচ্ছে এই যে, আমরা যে জীবন ব্যবস্থাকে বদলাতে চাই, তার দোষ-ত্রুটি এবং যাকে বাস্তবায়িত করতে চাই তার বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে, স্পষ্টভাবে, যুক্তিসহ এবং আকর্ষণীয় ভংগীতে পেশ করে একটি বাস্তব আন্দোলনের সূচনা করতে হবে। অতঃপর বিভিন্ন সময় দেশের সামনে উত্থিত তামাম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীতে যথাসময়ে অংশগ্রহণ করে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিধ্বনি করতে এবং এরই ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদগুলোর মুকাবেলায় নিজেদের মতাদর্শকে জয়যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। এমনিভাবে এই সংগ্রামকে এতোটা জনপ্রিয়, দূরদর্শী এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যে, সমাজের কোনো একটি শ্রেণীও যাতে এর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে না পারে। এইভাবে অবশ্যই এক সাধারণ মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, যার ফলে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় পণ্ডিত, লেখক, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থীগণও প্রভাবিত হবে। এই প্রতিক্রিয়া কিছু লোককে যেমন আমাদের বিরুদ্ধতায় উৎসাহিত করবে, তেমনি অন্যান্য লোকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের অনুকূলে পরিবর্তিত করে দেবে। আর এই পরিবর্তিত লোকেরাই নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় শিক্ষা ও জ্ঞান-গবেষণার প্রয়োজনীয় কাজে আত্মনিয়োগ করবে। এদের ভিতর যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শাখার সাথে সম্পৃক্ত এবং যতোখানি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত, সেখানে বসেই তার যোগ্যতা-প্রতিভা পরিবর্তিত মানসিকতার পথে কাজ করতে থাকবে। অতঃপর আমাদের এই সংগ্রাম আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূচনা করলে আমাদের আর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম করার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। বর্তমানে যে কোন কাজের জন্যে একটি গবেষণালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ব্যক্ত করা হচ্ছে। আজকের এই শিক্ষা বিভাগ, এই স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন ধরনের সরকারী ট্রেনিং-কেন্দ্রগুলো তখন সে কাজই সম্পাদন করতে থাকবে।

বলা বাহুল্য, আমরা গত কয়েক বছর থেকে এই দ্বিতীয় পন্থায়ই চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা করছি। আমাদের এই প্রচেষ্টা একদিকে গণ-সংশোধন এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি চলছে। যদি কার্যত সম্ভব হতো এবং প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণও সংগ্রহ করা যেতো, তবে আজ পর্যন্ত আমরা শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান শুধু একটি নয়, কয়েকটিই প্রতিষ্ঠা করে ফেলতাম। আজো আমরা সুযোগ পেলে এ কাজের জন্যে এক মুহূর্তও বিলম্ব করবো না। কারণ, এ কাজ আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এর প্রয়োজন ও উপকারিতা সম্পর্কে আমরা অতীতেও কখনো গাফেল ছিলাম না, এখনো নই। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে আমরা যে ব্যাপকতর সংশোধন ও পরিবর্তন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, এ কাজ যখন তার সংগে হাত ধরাধরি করে চলবে, আমাদের মতে তখনই তা লাভজনক হবে। সেই প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে নিজেদের তামাম চেষ্টা-সাধনাকে নিছক জ্ঞান-গবেষণামূলক কাজের প্রতি কেন্দ্রীভূত করা আমাদের দৃষ্টিতে এক বিরাট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর একমাত্র পরিণাম ফল এই হতে পারে যে, আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করেছি, তাও পণ্ডশ্রম হবে, আর ভবিষ্যতে যা কিছু করতে চাই, তাও হয়তো কোনোদিন সম্ভবপর হবে না।

ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী থেকে রাজনৈতিক অংশটি নাকচ করা কিংবা আপাততঃ মুলতবী রাখার সপক্ষে আজ পর্যন্ত এই যুক্তি ও কারণগুলোই আমি জানতে পেরেছি। তাছাড়া আরো কোনো কারণ থাকলে তাও আমরা জানতে চাইবো এবং শান্ত মনে সে সম্পর্কে চিন্তাও করবো। কিন্তু এইমাত্র যে কারণগুলোর আমি সমালোচনা করলাম, আমার মতে এমনি কোনো প্রস্তাবের জন্যে সেগুলো কোনো দিক দিয়েই যথেষ্ট নয়। অবশ্য সদস্যগণ এগুলোকে যথেষ্ট বলে বিবেচনা করবেন কিনা, তার চূড়ান্ত মীমাংসা তাঁদেরই এখতিয়ারাধীন।

অষ্টম ধারা

এই আলোচনার পর প্রস্তাবনার অষ্টম ধারা সম্পর্কে বেশী কথা বলার আর প্রয়োজন হয় না। এ ধারণাটিতে দু'টি বিষয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রথমতঃ কর্মসূচীর চারটি অংশেই ভারসাম্য সহকারে কাজ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ভারসাম্য বজায় না থাকাতে কোনো অবস্থাতেই এর কোনো অংশকে নাকচ বা মুলতবী করার যুক্তি হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

ভারসাম্যের গুরুত্ব ঃ

এর প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই কর্মসূচী যে পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত তার সাফল্য এর ভারসাম্যের উপরই সম্পূর্ণতঃ নির্ভরশীল। এর প্রতিটি অংশই অপর অংশের সহায়ক, একটি অপরটি থেকে প্রেরণা লাভ করে এবং তাকে প্রেরণা দান করে। কাজেই এর কোনো অংশকে নাকচ বা মুলতবী করে দিলে গোটা পরিকল্পনাই নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় না থাকলেও পরিকল্পনা নষ্ট হবেই। তাই এ পরিকল্পনা মাত্র একটি উপায়েই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে, তা হলো এই যে, দেশের জনসাধারণকে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে এক মতাবলম্বী করে তোলার জন্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আপনাদের অব্যাহত রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যে অনুপাতে দাওয়াত বিস্তৃতি লাভ করবে, সেই অনুপাতে আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে এক মতাবলম্বী লোকদেরকে তৈরি ও সংঘবদ্ধ করতে হবে। তৃতীয়তঃ নিজেদের শক্তি যতোটা বৃদ্ধি পাবে, সমাজের সংশোধন ও পুনর্গঠন প্রচেষ্টার পরিধিকে ততোই প্রসারিত করতে হবে। যাতে করে আপনাদের ঈপ্সিত সৎ ব্যবস্থাটি গ্রহণ ও রূপায়ণের জন্যে সমাজ যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে তৈরি হতে পারে। আর এই তিনটি কাজের সংগে সংগেই দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কার্যত পরিবর্তন সাধনের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলোকে ব্যবহার করার পুরোপুরি চেষ্টা করতে হবে। যাতে করে ঐ পরিবর্তন ও পরিচর্যার জন্যে আপনারা সমাজকে যতোটা তৈরি করেছেন, তদনুযায়ী বাস্তবিকই পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। মোটকথা, আপনাদের দৃষ্টিতে এই চারটি কাজেরই সমান গুরুত্ব থাকা উচিত। এর কোনোটিকে অপর কোনোটির উপর অগ্রাধিকার দেবার ভ্রান্ত ধারণা থেকে আপনাদের মন-মগজকে মুক্ত রাখা উচিত। এর কোনোটির ব্যাপারে

বাড়াবাড়ি করা থেকে আপনাদের বিরত থাকা উচিত। নিজেদের কর্মশক্তিকে যথাসম্ভব সমান অনুপাতে ঐ চারটি কাজের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার মতো বুদ্ধিমত্তা আপনাদের মধ্যে থাকা দরকার। কোন বিশেষ কাজের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ার ফলে অন্য কাজ ব্যাহত বা দুর্বল হয়ে পড়েছে কিনা, মাঝে মাঝে তাও যাচাই-পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।এমনি বিচার-বুদ্ধি ভারসাম্যমূলক চিন্তা আর সমানুপাতিক কাজের মাধ্যমেই আপনারা আপনাদের নির্ধারিত জীবন-লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন।

ভারসাম্যহীনতার দাবী কর্মসূচী পরিবর্তনের দলীল নয় ঃ

এরপর থাকলো আলোচ্য ধারার দ্বিতীয় বিষয়টি। এটি বোঝবার জন্যে খুব বেশী চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই।এমনি ধরনের সাদাসিধা কথা যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনায়াসেই বুঝতে পারে। ভারসাম্য একটি বুদ্ধি-বৃত্তিক ব্যাপার।এ এমন কোনো জড়বস্তু নয় যে, এর বজায় থাকা বা না থাকার ব্যাপারটা মেপে জুখে দেখা যেতে পারে। এক ব্যক্তি জামায়াতের অবস্থা ও কাজকর্ম দেখে হয়তো অনুমান করতে পারে যে, ভারসাম্য বজায় নেই। অন্য ব্যক্তি আবার এগুলো দেখেই মতস্থির করতে পারে যে, তা পুরোপুরি বজায় রয়েছে। কিংবা সমষ্টিগত কাজের যতোটা সমতা বিনষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তার বেশী বিনষ্ট হয়নি। সুতরাং অনুমান নির্ভর কোনো জিনিসের প্রতি যেহেতু বিভিন্ন লোকের অনুমান বিভিন্ন রকম হওয়াই স্বাভাবিক–এতোটা গুরুত্ব দেয়া কিছুতেই সমীচীন নয় যে, তার ভিত্তিতে জামায়াতের কর্মসূচীতে হামেশা রদবদলের দরজা উন্মুক্ত রাখার এবং ঘন ঘন পরিবর্তন ও নয়া কর্মসূচী রচনার প্রশ্ন উঠতে পারে। তবু ভারসাম্য সম্পর্কে মাপজোখ করে দ্বিমতের অবকাশ না থাকার মতো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ যদি সম্ভবপর হয়ও, তথাপি এক ধরনের ভারসাম্যহীনতাকে অন্য ধরনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টির জন্যে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে না। এর ভিত্তিতে বড়োজোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, সমতা কোথাও বিনষ্ট হয়ে গেলে তার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু একদিকে সমতা বিনষ্ট হয়েছে বলে অন্যদিকেও তা বিনষ্ট করতে হবে, এটা কিছুতেই যুক্তিসংগত হতে পারে না।

একটি দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি খুব সহজে বুঝতে পারেন। মনে করুন, একটি ব্যবস্থাপত্রের চারটি সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। কিছুদিন পর হঠাৎ আপনি

জানতে পারেন যে, একটি অংশের ওষুধ আপনি অনেক বেশী পরিমাণ ব্যবহার করে আসছেন এবং ব্যবহৃত ওষুধের মধ্যে বাকী তিন অংশের অনুপাত অনেক কম হয়ে গেছে। এমতবস্থায় আপনাকে তিন মাস কেবল এই শেষোক্ত তিন অংশের ওষুধই ব্যবহার করার এবং চতুর্থ অংশটি একেবারেই বর্জন করার পরামর্শ একমাত্র কোনো আনাড়ী চিকিৎসকই দিতে পারে।

ভারসাম্যের প্রশ্নে এক বিরাট ভ্রান্ত ধারণা ঃ

এই ভারসাম্যের প্রশ্নে ভুল ধারণার আর একটি কারণও আমাদের সামনে রাখা দরকার। সাধারণতঃ কেউ যখন প্রমাণ করতে চান যে, জামায়াতের কাজে কর্মসূচীর চারটি অংশের ভারসাম্য বজায় নেই, তখন তার বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, উক্ত অংশগুলোর নামে কৃত কার্যাবলীকেই তিনি প্রত্যেক অংশের কাজ বলে মনে করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে কাজের উপর 'দাওয়াতে'র লেবেল লাগানো থাকবে, তাকেই তিনি দাওয়াতী কাজ বলে গণ্য করবেন। সমাজ সংশোধনের নামে যে বিশেষ কাজটি সম্পাদন করা হবে, কেবল সেটিকেই তিনি ঐ অংশের কাজ বলে স্বীকৃতি দিবেন। অনুরূপভাবে যে কাজের উপর রাজনীতির লেবেল আঁটা রয়েছে, তাকে তিনি রাজনৈতিক কাজেরই ছকে ফেলে দিবেন এবং এই শিরোনামায় দাওয়াত প্রচার, জামায়াতের সম্প্রসারণ ও সমাজ সংশোধনেরও কোনো কাজ হয়েছে, এটা তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। এইভাবে কতিপয় ব্যক্তি জামায়াতের কাজকে বিভিন্ন নামের ছকে ফেলে রেখেছেন আর জামায়াতের অন্যান্য কাজের চাইতে তার রাজনৈতিক তৎপরতা বেশী বেড়ে গেছে বলে তাঁরা যে দাবী করেন, তারও ভিত্তি হচ্ছে এই। অথচ আলোচ্য কর্মসূচীতে আমরা আমাদের কাজকে যে চারটি আলাদা নামে ভাগ করেছি, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীবনের কোন্ কোন্ দিক ও বিভাগে আমাদের কি কি উদ্দেশ্যে প্রয়াস চালাতে হবে লোকদেরকে তা বুঝিয়ে বলা। এর ফলে বাস্তব ক্ষেত্রেও যে আলাদা-আলাদাভাবে কাজ করতে হবে, এর তাৎপর্য আদৌ তা নয়, আর কখনো তা হতেও পারে না। প্রকৃতপক্ষে এর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই অন্যান্য কাজগুলো আপনা-আপনিই শামিল হয়ে যায়। আপনারা যখন দাওয়াত প্রচারের কাজ করবেন, তখন ধর্মীয় ওয়াজের ভংগিতে তা শুধু দাওয়াত প্রচারই হবে না, বরং তার সংজ্ঞা জামায়াতের সম্প্রসারণ এবং সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্যও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ হতে থাকবে। আর এটাই হবে আপনাদের রাজনৈতিক

কাজও। পক্ষান্তরে আপনারা যখন রাজনৈতিক কাজের জন্যে উদ্যোগী হবেন. তখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ন্যায় তা শুধু রাজনৈতিক কাজই হবে না, বরং তার সূচনাই করা হবে দ্বীনের দাওয়াত থেকে; আর তার ভেতরে জামায়াতের সম্প্রসারণ ও সমাজ সংশোধনের উপাদানও অবশ্যই বর্তমান থাকবে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের ১৯৫১ সালের নির্বাচনী কাজের কথাই ধরুন। কেউ যদি তাকে শুধু রাজনৈতিক কাজই মনে করে থাকেন, তবে তা একান্তই তাঁর বুদ্ধির দোষ। নচেৎ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সেই নির্বাচনী অভিযানের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের কাজ যতোটা ব্যাপকভাবে সম্পাদিত হয়েছিলো,তার দ্বিতীয় কোনো নজীরই নেই। আপনারা তখনকার নির্বাচনী ঘোষণাপত্রটি (Menifesto) পড়ে দেখুন। তার উপর যদি দাওয়াত প্রচার কথাটি প্রযোজ্য না হয়, তাহলে আর কোন্ জিনিসটার উপর তা প্রযোজ্য হতে পারে, আমি বুঝি না। তখন যেসব বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছিলো, তার বিষয়বস্তুর উপরও আপনারা একবার দৃষ্টিপাত করুন। তার কোন্ বক্তৃতাটিতে দ্বীন–ইসলামের বুনিয়াদী দাওয়াত ছিলো না? এম্নিভাবে সেই নির্বাচনী অভিযানের কল্যাণে জামায়াতের সংগঠন সম্প্রসারণের যে কাজ হয়েছে শেষ পর্যন্ত তার মাধ্যমেই দূর দূরাঞ্চল পর্যন্ত মুত্তাফিক সংঘ গঠিত হয়েছে। পরন্তু সেই নির্বাচনী অভিযানে সাবেক পাঞ্জাবের দেড় হাজার বস্তির পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের উপযোগী সৎলোক সন্ধান করার নিমিত্ত সংঘবদ্ধ করা হয়েছিল। উক্ত বস্তিগুলো থেকে প্রায় সতেরোশ' কর্মী সংগ্রহ করা হয়েছিল। উক্ত কর্মীগণ আইন–শৃংখলা ও নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ আনুগত্যসহ নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে এক নির্ভেজাল আদর্শিক ও উদ্দেশ্যমুখীন নির্বাচনী প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সর্বোপরি প্রায় দেড় লক্ষ লোককে সরকারী জমিদারের চাপ, গোত্রীয় বিদ্বেষ ও আর্থিক প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে নিছক আদর্শের খাতিরে সৎলোকদের পক্ষে ভোটদান করার জন্যে তৈরি করা হয়েছিলো– সমাজ সংশোধনের এর চাইতে বড়ো কাজ আর কি হতে পারে?

বস্তুতঃ বিষয়টির এই দিকটি সামনে রাখা হলে যারা সমতা আর অসমতার প্রশ্নে কর্মসূচী রদবদলের দরজা হর–হামেশার জন্যে উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতী, তাদের বক্তব্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

নবম ও দশম ধারা

এবার আমি শুধু প্রস্তাবনার শেষ দুটি ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। উক্ত ধারা দু'টিতে বলা হয়েছে যে, আমরা নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করি আর পরোক্ষভাবে কিংবা উভয় পদ্ধতিতেই করি না কেন, তা থেকে কিছুতেই সম্পর্কহীন থাকতে পারি না। অবশ্য কখন, কিভাবে এবং কোন্ পন্থায় অংশগ্রহণ করা হবে, এটা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচনী কমিটির উপর ছেড়ে দেয়া উচিত, যাতে করে প্রত্যেক নির্বাচনকালে অবস্থা পর্যালোচনা করে মজলিস কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

নেতৃত্ব পরিবর্তনের একমাত্র পথ– নির্বাচন ঃ

এ সম্পর্কে নির্ভুল মতস্থির করার জন্যে তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আপনাদের সামনে রাখা দরকার।

প্রথমতঃ আপনারা এ দেশে ইসলামী জীবন পদ্ধতি কায়েম করতে ইচ্ছুক এবং তার জন্যে নেতৃত্বের পরিবর্তন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা যে দেশে কাজ করছেন, সেখানে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর সে ব্যবস্থায় নেতৃত্বের পরিবর্তনের একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন।

তৃতীয়তঃ একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে কোনো অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা শরীয়াত অনুযায়ী আপনাদের পক্ষে নাজায়েয। আর এজন্যেই জামায়াতের গঠনতন্ত্র আপনাদের ঈপ্সিত সংশোধন ও বিপ্লবের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করা আপনাদের প্রতি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

এই তিনটি মৌলিক সত্যকে মিলিয়ে যদি আপনারা চিন্তা করেন তো প্রস্তাবনায় যা বিবৃত হয়েছে, স্বভাবতঃ তাই ফলাফল দাঁড়াবে। আপনারা নির্বাচনে আজই অংশগ্রহণ করুন আর ১০, ২০, ৫০ বছর পরই করুন, এখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে নির্বাচনের পথই আপনাদের অবলম্বন করতে হবে।

প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করা দরকার ঃ

এ প্রসংগে এ সত্যটিও যদি আপনারা সামনে রাখেন যে, যে দেশে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী রয়েছে, যেখানে বিভিন্নরূপ মতবাদ ও

উদ্দেশ্যের ধ্বজাবাহী শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং আগে থেকেই এক বিশেষ ধরনের নেতৃত্ব শিকড় গেড়ে বসেছে, সেখানে রাতারাতি কোনো নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; বরং সেখানে এই পরিবর্তন অবশ্যই ক্রমিক ধারায় আসবে– তাহলে সেই ক্রমিক কাজটি যে আজ থেকেই শুরু করা দরকার, এ কথা বুঝতে আপনাদের এতটুকু বিলম্ব হবে না। এ কাজ আপনারা আজ শুরু করেন তো ১০, ২০ বছরের মধ্যেই মনজিলে মুকছুদে পৌঁছুতে পারবেন। আর ১০, ২০ বছর পর শুরু করলে এর পূর্ণতার জন্যে আরো দশ-বিশ বছর আপনাদের এন্তেজার করতে হবে। আপনারা কখনো এতখানি মর্যাদা লাভ করবেন যে, নির্বাচনের ময়দানে অবতরণ করতেই আপনাদের পয়লা পদক্ষেপটা শেষ মঞ্জিলে পড়বে–এমনি প্রত্যাশা করা নিতান্তই ভুল। সুতরাং যে কাজটি কোনো না কোনো সময় করতেই হবে এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে হলে যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, প্রথম সুযোগেই তা শুরু করে দেয়া এবং পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি সুযোগেই পূর্ববর্তী কাজের আলোকে সামনে এগোবার চেষ্টা করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

মতানৈক্যের কারণ ও তার দুর্বলতা ঃ

এর জবাবে একটি বড়ো যুক্তি দেয়া হয় যে, বর্তমান ভ্রান্ত সমাজে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্বের পরিবর্তনের চেষ্টা করা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়বারই সমতুল্য। কাজেই সমাজে সৎ ব্যবস্থার চাহিদা, সৎ লোকদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের বাছাই করার মতো যোগ্যতা সৃষ্টির জন্যেই প্রথমতঃ আপনাদের সমাজ সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। এরপরই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতাসীন হবার পর এতদুদ্দেশ্যে কার্যত কিছু করার মতো লোকদের নির্বাচিত হওয়া সম্ভবপর হবে। নতুবা সমাজের এই সর্বজনবিদিত বিকৃত চেহারা অপরিবর্তিত থাকলে নিছক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এজন্যেই নির্ভুল কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, কিছুকাল আমাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নিজেদের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে সমাজ সংশোধনের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। অতঃপর সমাজে একটি সৎ নেতৃত্বের চাহিদা এবং তার প্রতিষ্ঠার জন্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে বলে যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে, তখনই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। কেননা এটাই হবে তার জন্যে নির্ভুল সময়।

দৃশ্যতঃ এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এর গোটা বুনিয়াদই কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ঐ ধারণাগুলো থেকে একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বের করে যে কর্মনীতি পেশ করা হয়েছে, যুক্তি ও বাস্তব উভয় দিক দিয়েই তা অতীব ত্রুটিপূর্ণ।

ভ্রান্ত ধারণা ঃ

এ ব্যাপারে প্রথম ভ্রান্ত ধারণা হলো এই যে, এখানে সবাই সমাজ সংশোধনের কাজ ছেড়ে শুধু নির্বাচনের মাধ্যমেই নেতৃত্বের পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক। অথচ এটা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত। আমরা যে কর্মসূচী অনুযায়ী বছরের পর বছর ধরে কাজ করে চলছি এবং আজকে আপনাদের সামনে গোটা কাজের যে পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে, তার চারটি অংশের মধ্যে তিনটিই সমাজ সংশোধনের প্রোগ্রাম সম্পর্কিত। এটাই আমাদের স্থায়ী প্রোগ্রাম–নির্বাচন হোক আর নাই হোক, এর ভিত্তিতে বছরের ৩৬৫ দিনই আমাদের কাজ করতে হবে। সুতরাং নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে সমাজ সংশোধনের কাজ করা হবে, কি শুধু নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে– এখানে এটা কোনো মূল প্রশ্নই নয়, বরং সমাজ সংশোধনের এই সমগ্র প্রচেষ্টা চালু রাখার সংগে সংগে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করা হবে কিনা, এটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে এই যে, এই উভয় কাজই একসঙ্গে চলা উচিত। এখন এর ভিতর থেকে শুধু একটি কাজই চালু রাখা এবং অন্যটিকে বর্জন করা উচিত বলে যিনি মত পোষণ করেন, তিনিই তাঁর মতের সপক্ষে যুক্তিসংগত প্রমাণ নিয়ে আসুন। সেই সংগে আমরা কেবল সমাজ সংশোধনের কাজেই কেন ক্ষান্ত থাকবো এবং নির্বাচনের ফলাফল থেকে কেন ফায়দা হাসিল করবো না–এটাও তাঁদের স্পষ্ট করে বলা দরকার।

সমাজের ভাঙা-গড়ার সাথে নির্বাচনের সম্পর্ক ঃ

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা এই যে, নির্বাচন শুধু একটি ভোট দেয়া-নেয়ারই কাজ, এর সাথে সমাজের ভাঙা-গড়ার কোনোই সম্পর্ক নেই। অথচ প্রকৃতপক্ষে সমাজের গঠন ও ভাঙনে নির্বাচনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যিনি 'সমাজ সংশোধনে'র শুধু কথাটাই নয়, এর অর্থটাও সম্যকরূপে অবহিত, সমাজের উপর নির্বাচনের প্রভাবকে তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না। বিশেষ করে যে দেশের নির্বাচনের পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নীতি কার্যকরী রয়েছে, সেখানে তো ভোটদাতা আর সমাজ, প্রকৃতপক্ষে একই

জিনিসের দু'টি নামমাত্র। কেননা সমাজের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিই সেখানে ভোটদাতা। এমতবস্থায় যদি টাকার বিনিময়ে এদের কাছ থেকে ভোট কিনে নেয়া সম্ভবপর হয় কিংবা নানারূপ চাপ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ভোট লাভ করা যায়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনাদের চারদিকে একটি বিবেকহীন, লোভী ও নীতিহীন সমাজ তৈরি হচ্ছে এবং সেই সংগে জাতির এই নৈতিক দুর্বলতার অন্যায় সুযোগ গ্রহণকারী গুণ্ডা, বদমায়েশ, দালাল ও চরিত্রহীন ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদের এ সমাজ ট্রেনিং দান করছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ভোটদাতাদের কাছ থেকে যদি বংশ, গোত্র এবং প্রাদেশিকতার নামে ভোট গ্রহণ করা যায়, তবে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, আপনাদের এ সমাজকে সংকীর্ণতা, জাহেলী বিদ্বেষ এবং বিভেদ ও বিশৃংখলারও ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে; আর সেই সংগে আপনাদের সমাজের কিছু সুচতুর ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এই সব অস্ত্র ব্যবহার করার শিক্ষাও লাভ করছে। তৃতীয়তঃ ভাত-কাপড় ও অর্থনৈতিক স্বার্থের নামে কিংবা অন্য কোনো ধর্মহীন মতাদর্শ প্রচার করে ঐ সকল ভোটদাতার কাছ থেকে যদি ভোট নেয়া যায়, তবে তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আপনাদের গোটা সমাজ এবং তার প্রত্যেকটি বয়স্ক নারী-পুরুষকে বস্তুবাদ, দুনিয়াপূজা ও ধর্মহীন জীবনাদর্শের সপক্ষে ভোট দেয়ার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে।

নির্বাচনে এই তিন শ্রেণীর লোকই নিজ নিজ এলাকা থেকে অংশ গ্রহণ করবে; আর সমাজের বিকৃতি সাধনে এরা কে কতোটা সফলকাম হয়েছে, নির্বাচনের ফলাফলই তা মেপেজুখে ঠিক ঠিক মতো বলে দিবে, এইভাবে সমাজ বিধ্বংসী কাজের জন্যে এইসব লোককে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং নির্বাচন ছেড়ে আপনাদের শুধু সমাজ সংশোধনের কথা বলার কী অর্থ থাকতে পারে?

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যে ভোটারদের তৈরি করা সমাজ সংশোধনেরই প্রধান কাজ ঃ

পরন্তু সমাজকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্যে প্রস্তুত করাই যদি আপনাদের সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ভোটারদের সঠিক নির্বাচনের জন্যে তৈরি করা কিভাবে তার কর্মসীমার বহির্ভূত হতে পারে? আর এ কাজটি না করেই আপনাদের সমাজ কখনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতৃত্বকে অপসারিত করে একটি সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যোগ্য হবে– এটাই বা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? এজন্যে অবশ্যই ভোটারদের নৈতিক মূল্যবোধ বদলাতে হবে। ইসলামী জীবন পদ্ধতির সংগে তাদের পরিচিত করে তুলতে হবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকাংখা তাদের

মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। সৎ ও অসৎ নেতৃত্বের পার্থক্য তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এ দেশের ভালো-মন্দ এবং কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব যে তাদের উপরই ন্যস্ত, এ চেতনা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা যাতে অর্থের বিনিময়ে ভোট বিক্রি না করে, কারো হুমকিতে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাউকে ভোট না দেয়, কোনো ধোকাবাজের দ্বারা প্রতারিত না হয়, অথবা দুর্নীতির কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘরে বসে না থাকে– অন্ততঃ এটুকু নৈতিক শক্তি ও বিচার-বুদ্ধি তাদের ভিতর পয়দা করতে হবে। বস্তুতঃ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই কাজটুকুই আমরা করতে চাই।[১] কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে, এটা সমাজ সংশোধনের কাজ নয়? কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে, দেশের ভোটারদেরকে এইভাবে তৈরি না করেই এখানে কখনো নেতৃত্বের পরিবর্তন সূচিত হতে পারে?

নির্বাচন হতে বিচ্ছিন্ন থেকে সমাজ সংশোধনের জন্যে যতো পন্থাই আপনারা অবলম্বন করবেন তা লোকদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, নৈতিক চরিত্র, স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারকে অন্যান্য সমস্ত দিক দিয়ে অবশ্যই পরিশুদ্ধ করবে; কিন্তু তারা দেশের কর্তৃত্বের চাবিকাঠি কার উপর ন্যস্ত করতে ইচ্ছুক এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতৃত্বের পরিবর্তে সৎ নেতৃত্বকে ক্ষমতাসীন করার ব্যাপারে কতোখানি কৃতসংকল্প, তাদের নৈতিকতা ও মানসিকতার এই দিকটির সংশোধন-পরিশুদ্ধি নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো পন্থায়ই সম্ভবপর নয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, নেতৃত্বের পরিবর্তনের ব্যাপারে সমাজ–মানস ও নৈতিকতার এই দিকটাই হচ্ছে আসল মীমাংসাকারী জিনিস।

নির্বাচন শুধু সমাজ সংশোধনের মাধ্যমই নয়, তার মানদণ্ডও ঃ

এই প্রস্তাবের পিছনে তৃতীয় ভ্রান্তি হলো এই যে, আমরা নির্বাচন হতে আলাদা থেকে সমাজ সংশোধনের কাজ করতে করতে কোনো বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছেই এটা অনায়াসে জেনে নেবো যে, আমাদের সমাজে এক্ষণে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাংক্ষা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই ধারণার ভিত্তিতেই আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবো যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের যথার্থ সময় উপস্থিত হয়েছে।

---

১. ১৯৫১ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকালে এই কাজই আমাদের সামনে ছিলো। তখন জামায়াত যে নির্বাচনী ঘোষণাপত্র (Menifesto) প্রকাশ করেছিলো, তার ৮ থেকে ৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যকেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমার মতে, এ নিছক একটি অমূলক খোশখেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। কতিপয় লোক বিষয়টিকে নেহায়েত স্থূলভাবে দেখার ফলেই তাদের মনে এই খোশখেয়ালটি চেপে বসেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকদের নামাযী, পরহেজগার, ঈমানদার ও সংশোধনকামী হওয়া এক কথা আর চূড়ান্ত ফায়সালার সময় বিদ্বেষ,প্রলোভন, ভয়-ভীতি ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পাল্লাকে ভারী করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা কথা। প্রথম শ্রেণীর সাধারণ সংশোধনের কাজ আপনারা যতো খুশী এবং যতো ব্যাপক ভিত্তিতে চান,করতে থাকুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতো লোক এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সংশোধনকে কবুল করেছে, তা শুধু ফায়সালার সময়ই জানা যেতে পারে। আর সে ফায়সালার সময় আসে নির্বাচনেরই মওসুমে। এই মানদণ্ডই কয়েক বছর অন্ততঃ সমাজের মনোভংগী ও নৈতিকতার প্রকৃত অবস্থা এবং তার ভাল-মন্দের প্রতিটি দিক মেপে-জুখে দেখিয়ে দেয়। এ এক ধরনের আদমশুমারী। আপনাদের সমাজে ক'জন ভোট বিক্রয়কারী রয়েছে, ক'জন চাপের সামনে নতি স্বীকার করেছে, ক'জন প্রতারণার শিকার হয়েছে, ক'জন বিদ্বেষে লিপ্ত,ক'জন অনৈসলামী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, কি পরিমাণ দুর্নীতি এখানে প্রচলিত এবং এদের মধ্যে ক'জনকে আপনারা প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহায়তার জন্যে তৈরি করতে পেরেছেন– এর প্রতিটি বিষয়ই এ আদমশুমারী হিসাব করে বাতলে দেয়। সুতরাং এই মানদণ্ডের সম্মুখীন না হয়ে সমাজ সংশোধনের জন্যে আপনাদের কয়েক বছরের মেহনতের ফলে প্রকৃতপক্ষে কতোটুকু সংশোধনের কাজ সম্পাদিত হয়েছে, আর কতোটুকুই বা বাকী রয়েছে– আর কোন্ পন্থায় তা জানতে পারবেন?[১]

নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফল ঃ

উক্ত ভুল ধারণাগুলোর ভিত্তিতে যে প্রস্তাবটি তৈরি করা হয়েছে, তদনুযায়ী কাজ করলে কি ফল দাঁড়াবে, তা নিজেরাই একবার যাচাই করে দেখুন।

---

১. পশ্চিম পাকিস্তানের এক বিরাট অংশ আমাদের দশ বছরের সংশোধন প্রচেষ্টা কার্যত কতোখানি ফলপ্রসূ করতে পেরেছে, ১৯৫১ সালের নির্বাচনে এই মানদণ্ড তা আমাদেরকে মেপেজুখে বলে দিয়েছে। দেখুনঃ روداد مجلس شوری এপ্রিল,১৯৫১ এবং মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী।

নির্বাচনের সময় আমরা যদি নিজেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে নেমে ভোটারদেরকে কার্যকারী পথ-নির্দেশ না করি, তাহলে শুধু প্রচার, তাবলীগ আর নৈতিক উপদেশ তাদের পক্ষে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। তখন তো এই বাস্তব প্রশ্নই তাদের সামনে বড়ো হয়ে দেখা দেবে এবং আমাদের সামনেও তা তুলে ধরবে যে, আমি ভোট দেব কিনা এবং দেই তো কাকে দেবো?' এর জবাব 'তুমি ঈমানদারীর সংগে সৎলোককে ভোট দাও এবং অসৎ লোককে দিওনা' শুধু এটুকু বললেই প্রকৃতপক্ষে কোনো জবাব হবে না। তারা বরং একথাই বলবে যে, কোনো সৎলোক থাকে তো সামনে এনে দিন, নতুবা যারা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে, তাদের ভিতর কাকে ভোট দেবো, বলে দিন। তাদের এই সমস্যার সমাধান করতে না পারলে আমাদের থেকে তারা নিরাশ হয়ে যাবে। তারা মনে করবে, এদের দ্বারা এসময় কোনো কাজ হবে না। আমাদের প্রচার-তাবলীগ ও সদুপদেশ তাদের উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হবে না এবং সাধারণভাবে তারা অপাত্রেই ভোট দান করে বসবে। অথবা একান্তই তার কোনো প্রভাব তারা গ্রহণ করলে এ ভাবেই করবে যে, তারা কাউকে ভোটই দেবে না। অর্থাৎ নেতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করবে। ফলে যে শক্তিকে ইতিবাচকভাবে এক নির্ভুল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতো তা শুধু বৃথাই যাবে এবং নির্বাচনের উপর তা কিছুমাত্র প্রভাবশীল হবে না ।

এ পরিস্থিতি তো সাধারণ ভোটারদের বেলায় দেখা দেবে। এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর রুকন (সদস্য), মুত্তাফিক (সহযোগী সদস্য), প্রভাবাধীন ব্যক্তিবর্গ এবং যারা পথ-নির্দেশ লাভের জন্য জামায়াতের প্রতি মুখাপেক্ষী, তাদের এক বিরাট সংখ্যাগুরু অংশকে ভোট দান থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা তারা কাউকে ভোটদান করার সিদ্ধান্ত করতে পারবে, এই দেশের চৌহদ্দীর মধ্যে এমন প্রার্থী খুব কমই পাওয়া যাবে।

এবার একটু হিসাব করে দেখুন, সমগ্র পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর নিজস্ব প্রভাবাধীন মহলে কি পরিমাণ ভোট আছে এবং জনসমক্ষে নিজের আদর্শ প্রচার ও অন্যবিধ প্রয়াস-প্রচেষ্টা দ্বারা সে কার্যত কত ভোটারকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনারা কোনরূপ অত্যুক্তি ছাড়াই স্বীকার করবেন যে, এমনি ভোটার সংখ্যা মোটামুটি কয়েক লক্ষে উপনীত হয়েছে।[১] এই জিনিসটাকে সামনে রেখে

১. প্রকাশ থাকে যে, ছ'বছর আগে আমাদের আন্দোলন যখন জনগণের মধ্যে কাজের সূত্রপাত করে এবং প্রথমবার আমরা নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হই, তখন শুধু পাঞ্জাবেই আমরা দু'লাখ সতেরো হাজার লোকের কাছ থেকে ভোট লাভ করি এবং তাদের মোট ভোটসংখ্যা ছিল চার লাখের কাছাকাছি।

আপনারা নিজেরা আন্দাজ করে দেখুন,এমনিনেতিবাচক নীতি অনুসরণ করে কত বড় শক্তিকে আপনারা অপচয় করবেন। বস্তুতঃ এই বিরাট জিনিসটি দ্বারা কল্যাণের পাল্লাকে যেমন ভারী করা যায়, তেমনি অকল্যাণের পাল্লাকে হাল্কা করার জন্যেও একে ব্যবহার করা চলে। তাহলে এ শক্তিটিকেএমনিই অপচয় করার পিছনে আমাদের কি যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে?

এহেন কর্মনীতির ফলে শুধু কল্যাণের কাজে ব্যবহারোপযোগী একটি শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলার লোকসানই আমাদের হবে না, বরং প্রকৃতপক্ষে এটা বিভিন্ন দিক দিয়ে অকল্যাণের জন্যেও সক্রিয় সাহায্যকারী বলে প্রতিপন্ন হবে।

—এর ফলে দেশে অনৈসলামী মতাদর্শে প্রভাবান্বিত অথবা ভীতি, বিদ্বেষ ও প্রলোভনের চাপে ভোটদানকরী লোকদের সংখ্যা কত—নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটা প্রকাশ পাবে বটে; কিন্তু এ জনপদটির ক'জন লোক ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সমর্থক এবং তাঁর জন্যে ঈমানদারীর সাথে নিজের ভোট দান করতে প্রস্তুত, এ কথা অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এই জিনিসটা বিপর্যয়কারী শক্তিগুলোর জন্যে হবে উৎসাহব্যঞ্জক আর সংশোধন প্রয়াসীদের জন্যে হবে নিরুৎসাহজনক। পরন্তু জনসাধারণের মনস্তত্ত্বের উপরও এ ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে।

—এর ফলে বর্তমান নেতৃত্বের কবল থেকে নাজাত পাবার কোনো উপায় নেই বলে সাধারণ লোকদের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হবে এবং এ জন্যে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে তার সামনেই আত্মসমর্পণ করে বসবে।

—পরন্তু এখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার ব্যাপারে কার্যত কিছু করা যেতে পারে— এ সম্পর্কে লোকেরা নিরাশ হয়ে যাবে। কারণ তারা দেখতে পারে যে, যারা এই কাজের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এগিয়ে এসেছিলো, চূড়ান্ত ফয়সালার সময় তারাই ময়দান থেকে পিছু হটেছে। এর ফলে সাধারণ লোকদের মনে নিশ্চিতভাবে এই ধারণার সৃষ্টি হবে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কথাটা নিছক ওয়াজ নসিহতের ব্যাপার, কাজ করে দেখাবার জিনিস নয়।

—এরপর সমাজের মন-মানস ও নৈতিক চরিত্রকে বিকৃত করার এবং ধ্বংসাত্মক নেতৃত্বকে ক্ষমতাসীন করার প্রয়াসী ব্যক্তিরাই শুধু ময়দানে থেকে যাবে। এরা দেশের গোটা বয়স্ক জনগণের মধ্যে নিজেদের আদর্শিক ও নৈতিক ভ্রান্তি বিস্তার করবে এবং প্রতিটি ভোটারকে নিজেদের নাপাক প্রভাবে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে এ বিষক্রিয়াকে নষ্ট করার উপযোগী কোনো শক্তি

ময়দানে বর্তমান থাকবে না। বস্তুতঃ নির্বাচনকালে শুধু নেকী ও কল্যাণের ওয়াজ করার জন্যে জামায়াতে ইসলামী যতো বড়ো প্রোগ্রামই তৈরি করুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে অবতরণ না করে কর্মীদের পক্ষে প্রতিটি ভোটারের কাছে পৌঁছা এবং প্রত্যেক নির্বাচনী কেন্দ্রে দুষ্কৃতির মুকাবেলায় সুকৃতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা স্বভাবতঃই এক অসম্ভব ব্যাপার।

–ফলে ভোটারগণ শুধু অসৎ ও দুষ্কৃতকারী লোকদেরই সম্মুখীন হবে। তারা এদের ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবার চিন্তা করতে পারে, তাদের সামনে এমনি কোনো বিকল্প প্রার্থীই থাকবে না। এমতবস্থায় যে ব্যক্তি ভোট দেবে, তার ভোট অবশ্যই এদের ভেতর থেকে কেউ লাভ করবে। আর যে ভোট দেবে না, তার ভোট তো কোনো পাল্লাকেই ভারী করবে না বরং তার ভালো-মন্দ কোনো প্রভাবও দেখা যাবে না।

–এভাবেই আমরা অনৈসলামী ও অনৈতিক শক্তিগুলোকে এখানে জাঁকিয়ে বসবার অবাধ সুযোগ দান করবো। তারা আইন পরিষদ ও পার্লামেন্টের ভেতরও এমনি জেঁকে বসবে যে, তাদের কথাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো দ্বীনদার লোকই সেখানে থাকবে না। অনুরূপভাবে বাইরের জনমনের উপরও তারা একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে ফেলবে। কেননা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সমর্থকগণ কার্যত পূর্বেই তাদেরকে নিরাশ করে বসবে।

বস্তুতঃ আলোচ্য কর্মনীতির এইসব অনিবার্য পরিণতি থেকে আমরা কিছুতেই বাঁচতে পারি না। এরপরও যে ব্যক্তি আমাদেরকে নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার উপদেশ দিবে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোন্ কোন্ কুফল এবং বিচ্ছিন্ন থাকারই বা কোন্ কোন্ সুফলকে সে উল্লিখিত পরিণতিগুলোর চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণ করতে পারে, তা তাকে স্পষ্টতঃ বলে দিতে হবে।

মতানৈক্যের আরো কতিপয় কারণ ঃ

এ ব্যাপারে আলোচ্য চিন্তাধারায় সমর্থকদের কাছ থেকে আমি যেসব কথা শোনবার সুযোগ পেয়েছি, তার ভিতর বড় জোর তিনটি কথা বিবেচনাযোগ্য ঃ

প্রথমতঃ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে জামায়াতের নৈতিক চরিত্রের সর্বনাশ হবে।তারা বল্লাহীন রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অগ্রসর হলে তাদেরই মতো কথাবার্তা বলবে এবং তাদের ন্যায় খেলা খেলতে শুরু করবে।

দ্বিতীয়তঃ পাঞ্জাব সীমান্ত এবং বাহাওয়ালপুরের নির্বাচনে যেসব অস্ত্রব্যবহার করা হয়েছিলো, অন্যান্য নির্বাচনেও সেইসব অস্ত্রই ব্যবহৃত হবে এবং জনসাধারণ শুধু গাফলতেই লিপ্ত থাকবে না, বরং বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতার কারণে তাদের এক বিরাট অংশই ভোটাধিকারের অপব্যবহার করবে। এমনি পরিস্থিতিতে কামিয়াবীর সম্ভাবনা খুবই কম আর ব্যর্থতার পরিণতি নিংসন্দেহে চরম নৈরাশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদসমূহে যদি কয়েকটি মাত্র আসন লাভ করা যায়ও, তবু তাতে কি-ইবা ফায়দা হবে?

নৈতিক দেউলিয়াপনার আশংকা ঃ

প্রথম কথার জবাব এই যে, জামায়াতে ইসলামী আজ পর্যন্ত দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সুকৃতিকে বিকশিত করার নীতিকেই অনুসরণ করে আসছে। এবং তার ভিতরে ভালো-মন্দ যা কিছু চরিত্রই তৈরি হয়েছে, এই আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করার ফলেই হয়েছে। এখন যদি সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান থেকে সরে গিয়ে ঘরের কোণে বসে চরিত্র গঠনের মতবাদ গ্রহণ করতে হয় তো জামায়াত সদস্যদের খুব ভেবে-চিন্তেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি– আর তা হলো এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান থেকে সরে গিয়ে ঘরের কোণে বসে যে চরিত্র তৈরি হবে,লড়াইর সময় তা আদৌ কাজের উপযোগী বিবেচিত হবে না।

তাছাড়া আরো ভাবনার কথা এই যে, পনেরো-ষোলো বছরের রাজনৈতিক সংগঠনের পরও যদি জামায়াতে ইসলামীর নৈতিক চরিত্র এতোটাই ঠুনকো হয় যে, রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের মুখোমুখি হলেই এরা তাদেরই মতো সব কিছু করতে শুরু করবে, তবে ভবিষ্যতে এমনি চূড়ান্ত লড়াইয়ে কখনো আমরা নির্ভরযোগ্য স্বভাব-চরিত্র নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারবো-এর কতোটা আশা করা যেতে পারে? এমনি চরিত্র গঠনের জন্যে আপনারা কতোদিন সময় নির্দিষ্ট করে দিতে চান? এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা লাভের কি উপায় এবং এর কি মানদণ্ড আপনাদের সামনে রয়েছে? বাস্তব পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েই কর্মীদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মানের স্বভাব-চরিত্র পয়দা করার উপযোগী কি কোর্স আপনাদের কাছে রয়েছে? যদি সমগ্র প্রচেষ্টার পরও প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই আপনারা শতকরা একশো ভাগ 'আদর্শ মানুষ' পেশ করতে ব্যর্থ হন, তবে সে ক্ষেত্রে

আপনাদের অভিপ্রায় কি? জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার নেতৃত্ব থেকে উক্ত রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের অপসারণ করতে সামনে এগুবেন, না তাদের হাতে ময়দান ছেড়ে দিয়ে ট্রেনিং কেন্দ্রের দিকে ফিরে যাবেন? আমার ধারণায় এমনি ঠুনকো ও স্পর্শকাতর মানসিকতা ও অবাস্তব চিন্তাধারা নিয়ে এই ধরনের লড়াইয়ে আপনারা কখনো অবতরণ করতে পারবেন না। কাজেই আপনাদেরকে দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবেঃ হয় আপনারা এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত করুন, নতুবা এদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যত কিছু করার খেয়ালই পরিহার করুন। কারণ, এ কাজ যখনই আপনারা করতে চাইবেন, ঐ রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে নির্বাচনে নেমে অবশ্যই আপনাদের লড়তে হবে আর লড়াইয়ের ময়দানে অবতরণ করার ইচ্ছা যখনই আপনারা পোষণ করবেন, এ আশংকা অবশ্যই আপনাদের মনে চেপে বসবে যে, না জানি জামায়াত তার সমস্ত নৈতিক পুঁজিটুকুই বুঝি এতে খুইয়ে বসে!

আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, এই আশংকাকে আমি ঠুনকো ও স্পর্শকাতর মানসিকতা এবং অবাস্তব চিন্তাধারা বলে কেন আখ্যা দিয়েছি? এর জবাব এই যে, আমার কাছে এর যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী আজ কেবলমাত্র গুহা থেকে বেরিয়ে এসে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেনি আর জামায়াত হিসাবে আমরা তার শক্তি ও দুর্বলতা এবং সৌন্দর্য ও দোষত্রুটি যে আন্দাজ করতে পারি না, তাও নয়। গত দশ বছর ধরে সে পাকিস্তানে এমন সব শক্তির সংগে সংগ্রামে লিপ্ত, যারা সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধকে শিকায় তুলে রেখে তার চলার পথ শুধু রোধ করেই আসছে। একটি মানবীয় জামায়াত যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে, এ সময়ের মধ্যে তার প্রায় প্রত্যেকটি পরীক্ষায়ই সে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার ঝড় তোলা হয়েছে তার উপর ফতোয়ার আঘাত হানা হয়েছে। তার প্রতি গালাগালি বর্ষণ করা হয়েছে! তাকে নানারূপ চক্রান্তের মুকাবেলা করতে হয়েছে। মোটকথা, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকার বাধার পাহাড়ই তার পথ রোধ করে এসেছে। তার ইতিহাসে কয়েকবার কঠিন উত্তেজনাকর পরিস্থিতিও দেখা দিয়েছে। তাকে প্রলোভন ও ভয়-ভীতি উভয় পন্থায়ই যাচাই করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে তার যেমন মেলামেশার, তেমনি লড়াই করারও সুযোগ ঘটেছে। কয়েকবার তাকে চরম নিরুৎসাহ ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিরও সম্মুখীন

হতে হয়েছে। পরন্তু গত কয়েক বছর ধরে এদেশের রাজনৈতিক ওলট-পালটের যে পরিবেশ অব্যাহত রয়েছে, তাতে এমন সুযোগ হামেশাই বর্তমান ছিলো যে তার সামগ্রিক চরিত্রে সামান্য মাত্র শৈথিল্য থাকলেও অপরাপর বহু লোকের মতো এই প্রবাহিত গংগায় সেও হাত ধুয়ে নিতে পারতো। আমি জিজ্ঞাসা করি, আজ জামায়াতকে যতোটা কমজোর মনে করা হচ্ছে,দশ বছরের এই ক্রমাগত পরীক্ষায় সে কি বাস্তবিকই ততোটা কমজোর প্রতিপন্ন হয়েছে?

তাছাড়া নির্বাচনও জামায়াতের পক্ষে কোনো নতুন জিনিস নয়। ইতঃপূর্বে সে এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। তার কর্মীরা জাল ভোটের ছড়াছড়ির মুকাবেলা করেছে। দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা দেখেছে, বিবেক কেনা-বেচার চড়া বাজার প্রত্যক্ষ করেছে, রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের দর কষাকষি দেখেছে এবং মিথ্যা প্রচারণার এমন নজীরহীন ঝড়ের মুকাবেলা করেছে, সম্ভবতঃ দুনিয়ার অন্য কোনো দেশেও যা কেউ কখনো দেখেনি। তদুপরি কোনোরূপ পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই এ ধরনের কঠিন নির্বাচনী যুদ্ধে তাদের প্রথমবার নামিয়ে দেয়া হয় এবং উপায়-উপকরণের নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও তাদেরকে সরকার কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা ও অসুবিধাদির মুকাবেলা করতে হয়। সেই সংগে গোত্রীয় বিদ্বেষও তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এমনকি, কোনো-কোনো ধর্মীয় উপদল পর্যন্ত তাদের অপপ্রচার করতে কসুর করেনি। কোনো খোদার বান্দাহ্ কি ইনসাফের সংগে বলতে পারেন যে, এই পরীক্ষায় জামায়াত নৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া প্রমাণিত হয়েছে?

এটা কোনো অভিমত বা অনুমানের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে বাস্তব ঘটনার। পরন্তু কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্রেরও প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে জামায়াতের সামগ্রিক চরিত্রের। কেউ কি এই দশ বছরের ইতিহাসে জামায়াতের দেহে কোনো নৈতিক কালিমা নির্দেশ করতে পারেন? যদি না পারেন তো স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমানে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংগ্রামে সামনে এগুবার জন্যে যেটুকু ন্যূনতম নৈতিক শক্তির প্রয়োজন এবং এই বিকৃতিদুষ্ট সমাজ থেকে যতোটা নির্ভরযোগ্য নৈতিক শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব, তা আমাদের কাছেই মওজুদ রয়েছে। একে নিয়ে আমরা সামনে এগুতে পারি। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকতর নৈতিক শক্তি পয়দা করতে পারি। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যেসব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, তা নিরসন করার কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারি। আদর্শচ্যুত লোকদেরকে শোধরানোর ব্যবস্থা করতে পারি, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জামায়াত থেকে বের করেও দিতে

পারি। এই সকল বিষয়কে উপেক্ষা করে যারা কতিপয় কাল্পনিক আশংকা আমাদের সামনে পেশ করেন, কতিপয় ব্যক্তিগত ঘটনাকে জোড়াতালি দিয়ে জামায়াতের সামগ্রিক অবস্থার এক ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেন এবং কাজ করার শর্ত হিসাবে নিজেদের পক্ষেও নির্ণয় করার অনুপযোগী এক নৈতিক মানের দাবী করেন– তাদেরকে অবাস্তব কল্পনাবিলাসী ছাড়া কি বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ তাদের কল্পনার জগত বাস্তব জগত থেকে বহু দূরে অবস্থিত। তাদের মতানুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে যদি আমরা জামায়াতের সামগ্রিক দুর্বলতা বলে ধরে নিয়ে গোটা জামায়াতকেই অকেজো মনে করতে থাকি, তবে এ জামায়াত কেন কোনো মানবীয় জামায়াতই কোনোদিন কর্মোপযোগী হতে পারে, এটা কখনোই প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। আর এই যদি হয় তো শান্ত মনে এই দুনিয়াকে ফাসেক ফাজেরদের হাতেই সঁপে দিন এবং নিছক ওয়াজ-নছিহত করে নিজেদের মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে থাকুন যে, এখানে দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্তব্য এর বেশী পালন করা যায় না। এটাই হবে আপনাদের পক্ষে উত্তম!

ব্যর্থতার আশংকা ঃ

এবার দ্বিতীয় কারণটি নিন। এর যুক্তিধারা এই যে, রাজনৈতিক দল ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ব্যবহৃত নির্বাচনী হাতিয়ারগুলোর মুকাবেলায় আমাদের পক্ষে কৃতকার্য হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। অধিকতর সমস্যার ব্যাপার এই যে, আমাদের জনসাধারণ যেমন গাফিল,তেমনি তাদের এক বিরাট অংশ সজ্ঞানেই অপাত্রে ভোটদান করে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই সমধিক। পরন্তু এই ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতিতে আমাদের কর্মীরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে হতাশার সঞ্চার হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে এ আন্দোলনের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সাফল্যের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত না হলেও অন্ততঃ বড় রকমের ব্যর্থতার আশংকা যাতে না থাকে, নির্বাচন হতে বিচ্ছিন্ন থেকে আমাদের তেমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা দরকার।

আমি স্বীকার করি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। এও স্বীকার করি যে, ব্যর্থতার ফলে জনমনেও খারাপ প্রভাব বিস্তার করে, আন্দোলনের সমর্থকরাও নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে এবং আমাদের কর্মীদের মধ্যেও কিছুটা বীতশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার

জন্যে এটাকে কোন নির্ভুল ও যুক্তিসংগত কারণ বলে আমি স্বীকার করি না। কারণ ব্যর্থতার যে কারণগুলো বিবৃত করা হচ্ছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তার একটি কারণও দূর করা যেতে পারে না। বিচ্ছিন্ন থাকলে এই কারণগুলো হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এগুলো প্রতিকারের একমাত্র পন্থা এই হতে পারে যে, ক্রমাগত এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করে এগুলোর মুকাবেলা করতে হবে এবং এগুলোর শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে।

আপনারা নিজেরাই একটু চিন্তা করে দেখুন। রাজনৈতিক দলগুলো যে নির্বাচনী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে এবং শাসন ক্ষমতার বর্তমান ধারকগণ যার ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা, নির্ভীকতা ও বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছিলো, তা আপনা-আপনি পরিত্যক্ত হবে বলেই কি আপনারা মনে করেন? আপনারা কি ধারণা করছেন যে, এই লোকগুলো ক্রমে ক্রমে এতটা সাধু-সজ্জন হযে যাবে যে, এইসব অস্ত্র ব্যবহারে তারা লজ্জানুভব করবে? নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্যে আপনারা কি এমন একটি শুভ মুহূর্তের প্রত্যাশা করেন,যখন দুষ্কৃতকারী লোকেরা ময়দান থেকে সরে দাঁড়াবে এবং নিছক ভদ্রলোকদের সংগেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থাকবে? এই যদি আপনাদের আকাঙ্ক্ষা হয় এবং এই শর্তগুলো পূর্ণ হলেই আপনারা নেতৃত্বের পরিবর্তনের একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করতে চান, তবে আপনাদের এই আকাঙ্ক্ষা ও শর্তাবলী কবে পূর্ণ হবে এবং কবে আপনারা এই সৎকাজের জন্যে অগ্রসর হতে পারবেন, আমি জানি না। নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে আপনারা যদি বাস্তবিকই কিছু করতে চান তো এই 'নোংরা খেলায়' পবিত্রতার সাথে এগিয়ে আসুন, বৈধ পন্থায় তামাম অবৈধ অস্ত্রের মুকাবেলা করুন। জাল ভোটের মুকাবেলায় নির্ভেজাল ভোট দিন। অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয়কারীদের মুকাবেলায় নীতি ও আদর্শের খাতিরে ভোটদানকারীদের নিয়ে আসুন। ধোঁকা, প্রতারণা ও মিথ্যার দ্বারা কাজ হাসিলকারীদের মুকাবেলায় ইস্পাত-কঠিন ঈমানের পরিচয় দিন।এর ফলে একবার নয়, দশবার পরাজয় বরণ করতে হলেও করুন। আপনারা এখানে কোনো পরিবর্তন আনতে চাইলে একমাত্র এইভাবেই আনতে পারেন। এইভাবে কাজ করতে করতে এমন এক সময় আসবে, যখন সমস্ত অবৈধ অস্ত্র প্রয়োগ করা সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীরা পরাভূত হবে। এ ভাবেই ঐ সব দোষ-ত্রুটির বিরুদ্ধে জনমনে ঘৃণা ও অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা যাবে। আর এভাবেই নির্বাচন-পদ্ধতির সংশোধনের পথ উন্মুক্ত হবে।

পরন্তু জনসাধারণের যে নির্লিপ্ততা, অজ্ঞানতা ও নৈতিক দুর্বলতার কথা আপনারা ইনিয়ে-বিনিয়ে বিবৃত করেন, তার সংশোধনও একমাত্র এই পন্থায়ই হতে পারে। এর দ্বারাই তাদের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হবে। এর দ্বারাই লোকদের মনে এই আশাবাদের সঞ্চার হবে যে, বৈধ ও সংগত পন্থায়ও এখানে কাজ করা যেতে পারে। এর দ্বারাই লোকদের ভয়-ভীতি দূরীভূত হবে, ভোট-বিক্রির ব্যাধি হ্রাস পেতে থাকবে এবং জনসাধারণ স্বার্থ ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে ভোটদানের পরিবর্তে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে অবাধে ভোটদানের উপযোগী ট্রেনিং লাভ করতে থাকবে।

নিঃসন্দেহে এ একটি দুর্গম পথ। এতে হোঁচট খেতে হবে, পরাজয় বরণ করতে হবে, দুর্বল-চিত্ত লোকেরা নিরুৎসাহীও হবে। আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকদেরও অনেকের মনে হতাশার সঞ্চার হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, জনসাধারণেরও একটি বিপুল অংশ এই প্রাথমিক পরাজয় থেকে ভুল অর্থ গ্রহণ করবে। কিন্তু এই দুর্গম পথ ছাড়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার আর কোন বিকল্প পথ নেই। আর এ ব্যাপারে যতো বড়ো কাল্পনিক পরাজয়ের ভয় আমাদের দেখানো হয়, ততো বড়ো পরাজয়ের আশংকা আমি পোষণ করি না। আমি মনে করি, সমস্ত অবৈধ পন্থার মুকাবেলায় নিরেট আদর্শিক কর্মনীতি গ্রহণ করে, এই নির্লিপ্ত ও কমজোর জনসাধারণের মধ্য থেকেই আমরা কয়েক লক্ষ ভোট অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারবো। আর এটা এ দেশের তামাম ইসলামপছন্দ ও সংশোধনকামী মহলেই নৈরাশ্যের পরিবর্তে আশার দীপ প্রজ্বলিত করবে। পরন্তু আমি এ আশাও পোষণ করি যে, একটি নির্বাচনে এই ধরনের ভোটের যে অনুপাত হবে, পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে তা মোটেই হ্রাস পাবে না, বরং ক্রমশ তা বাড়তেই থাকবে, ইনশাআল্লাহ। এমনকি, শেষ পর্যন্ত মানদণ্ডের গতি বদলে যাবেই।

মাত্র কয়েকটি আসন লাভ ?

এখন প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, বর্তমান সময়ে যদি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদসমূহে কয়েকটি আসন লাভ করাও যায় তো তা দ্বারা কি লাভ হবে? আমি বলতে চাই যে, এ–দ্বারা শুধু কিছু নয়, অনেক কিছুই লাভ হবে।

বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী শুধু জনসাধারণের মধ্যেই কাজ করবে। এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার মূল চাবিকাঠি যে ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানটির

করায়ত্ত, তাতে জামায়াতের কোনোই অংশ নেই। এই কারণেই তার বিপুল নৈতিক ও মানসিক প্রভাব সত্ত্বেও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর সে সরাসরি প্রভাবশীল হতে পারছে না। কিন্তু নির্বাচনে কয়েকটি আসন লাভ করার পরই তার এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করবে। এদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে একবার জায়গা করে নিতে পারলে আমাদের কথার ওজন কতোখানি বেড়ে গেছে, তা নিজেরাই আপনারা অনুভব করতে পারবেন।

এপর্যন্ত আপনারা শুধু জনগণের মধ্যেই আওয়াজ তুলে আসছেন। কিন্তু ফায়সালার স্থান আইন পরিষদে আপনাদের কোনোই আওয়াজ নেই। সেখানে পৌঁছুতে পারলে আপনাদের আওয়াজ সর্বত্রই বুলন্দ হবে। পরন্তু যাদের আওয়াজ শুধু আইন পরিষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিংবা বাইরে থাকলেও তার প্রতি জনগণের বিশেষ কোনো সমর্থন নেই, তাদের চাইতে আপনাদের আওয়াজ অধিকতর জোরালো প্রতিপন্ন হবে।

বস্তুতঃ পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদের অভ্যন্তরে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে সত্যের কালেমা বুলন্দ করা, নির্বাধে ও সুস্পষ্টভাবে ভ্রান্ত জিনিসগুলোর সমালোচনা করা এবং ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আইন-কানুনের যে সংস্কার-সংশোধন হওয়া উচিত, তাকে যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব ও খসড়া আইনের আকারে তৈরি করে গ্রহণ বা বর্জনের জন্যে পেশ করার উপযোগী একটি দলের উপস্থিতি এক বিরাট বিপ্লবেরই সূচনা করবে। এই দলটির শক্তি শুধু এর লোকসংখ্যা দেখেই আপনারা পরিমাপ করবেন না; বরং সত্য কথা পেশ করা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং প্রস্তাবনা বা খসড়া আইনের আকারে ইসলামের দাবী তুলে ধরা হলে তাকে বর্জন করা কতোখানি কঠিন হয়ে পড়বে আর বর্জনকারীদের অবস্থাই বা কি দাঁড়াবে—এর দ্বারাই তা পরিমাপ করে দেখুন।

পরন্তু এই দলটি আইন পরিষদে গিয়ে একটি খালেস আদর্শবাদী দল হিসেবে কাজ করবে। এ কোনো রাজনৈতিক ভাঙাগড়ায় অংশগ্রহণ করবে না; কারো সংগে দর-কষাকষি করবে না; কোনো পদমর্যাদার লোভে বিবেক বিক্রি করবে না; ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে নাজায়েয স্বার্থ-সিদ্ধিরও প্রয়াস পাবে না। সর্বোপরি এর সদস্যদেরকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যাওয়া পাহাড় গুঁড়ানোর চাইতেও অধিকতর কঠিন প্রতিপন্ন হবে। এমনি একটি দলের অস্তিত্ব এদেশের রাজনৈতিক জীবনে এমন এক গুরুত্ব ও মর্যাদার সৃষ্টি করবে, যা কোনো বৃহত্তম রাজনৈতিক

দলের পক্ষেও সম্ভব হবে না। তবু এই দলটির গুরুত্ব আপনারা শুধু আইন পরিষদে প্রাপ্ত এর ভোট-সংখ্যা দেখেই পরিমাপ করতে পারেন না; এর ভোটশক্তি যতো কমই হোক না কেন, আইন পরিষদের ভেতরের ন্যায় বাইরেও এর বিরাট নৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হবে। বস্তুতঃ এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর স্বভাব-চরিত্র ও কীর্তিকলাপে যারা নিরাশ হয়ে পড়েছে; নিজস্ব কাজের দ্বারা এই দলটি তাদের আশার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে। এর ফলে জামায়াতে ইসলামীর প্রভাব ও শক্তি কতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্বিতীয় নির্বাচনের সুযোগ আসা পর্যন্ত তা আপনারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

তাছাড়া এ ধারণাটাও ভুল যে, এই দলটি যে সংখ্যাশক্তি নিয়ে পরিষদে যাবে, তার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেই সংখ্যাই বর্তমান থাকবে এবং এর বিপরীত পরিষদে তার সংখ্যাশক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে বলেই আমি আশা রাখি। তার কারণ, অন্যান্য পন্থায় যারা পরিষদের সদস্য হয়েছেন, তাদের সবাই একবারে বিবেকহীন নয়। তাদের এক বিপুলসংখ্যক লোকের মধ্যে কোথাও না কোথাও বিবেক নামক একটি বস্তু আত্মগোপন করে আছে। তারা পরিষদের 'নোংরা খেলা' দেখে কখনো কখনো তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ হয়েও ওঠে। কিন্তু তারা নিজেরা না কোনো দল গঠন করতে পারে আর না এইসব নোংরামি থেকে মুক্ত কোন দল সেখানে বর্তমান থাকে, যাতে তারা শামিল হতে পারে। এমতবস্থায় একটি আদর্শবাদী ও ঈমানদার জামায়াত যদি সেখানে উপস্থিত থাকে এবং কাজের মাধ্যমে সে নিজের আস্থা প্রতিষ্ঠা কতে পারে, তবে যখনই পরিষদ-সদস্যদের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হবে, তখনই এই দলটিতে তাদের যোগদান করার সম্ভাবনা থাকবে।

এ সম্পর্কে শেষ কথা এই যে, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় একটি দলের শক্তি শুধু তার সদস্য-সংখ্যার ভিত্তিতেই নিরূপিত হয় না। একাধিক দল বিশিষ্ট পরিষদে প্রায়শই এমনিই হয়ে থাকে যে, একটি নগণ্য সংখ্যক দলের হাতেই শক্তির ভারসাম্য চলে যায়। সুবিধাবাদী ও স্বার্থপূজারী দলগুলো এমনি মওকাকে দর কষাকষির জন্যে ব্যবহার করে থাকে কিন্তু সেখানে যদি এমন একটি সংঘবদ্ধ দল বর্তমান থাকে, যার সামনে রয়েছে একটি সুমহান লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যের খাতিরেই সে ঐক্য বা মতানৈক্য করতে প্রস্তুত, তবে সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও সে বড়ো-বড়ো পার্টির দ্বারা নিজের দাবী মানিয়ে নিতে পারে। এর একাধিক দৃষ্টান্ত এ-দেশেই আপনারা দেখতে পেয়েছেন। বর্তমানে পাকিস্তানের

রাজনৈতিক দলগুলোর যে বিচিত্র ভূমিকা পরিদৃষ্ট হয়, পরিষদে গিয়েই তারা যেভাবে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে দেয়, তা দেখে আমার মনে হচ্ছে ঃ মজবুত চরিত্রের অধিকারী কতিপয় ব্যক্তির একটি ক্ষুদ্র ব্লকও যদি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকে তো সেই ব্লকটিই সবার ওপর কর্তৃত্ব চালাতে পারে।

‘প্রত্যক্ষ’ ও ‘পরোক্ষ’ পদ্ধতি ঃ

এই আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নির্বাচন সম্পর্কে প্রস্তাবনায় যে কর্মনীতি পেশ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও যুক্তিসংগত এবং আমাদের কর্মসূচীর রাজনৈতিক অংশে পূর্ণতা বিধানের জন্য ঐ কর্মনীতি অনুসারে কাজ করা একান্তই অপরিহার্য।

এরপর নির্বাচনে প্রত্যক্ষ পন্থার সংগে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণের তাৎপর্য কি এবং কি কি অজুহাতের ভিত্তিতে এই দ্বিতীয় পন্থাটিকে কর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কেবল এটুকুরই বিশ্লেষণ বাকী থেকে যায়।

এ প্রসংগে পরোক্ষ পন্থাটির অর্থ উপলব্ধি করাটা মোটেই জটিল ব্যাপার নয়। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, আমরা সরাসরি নিজেদের উদ্যোগেই কিছু লোককে তো প্রেরণ করবোই, সেই সংগে যারা ইসলামী জীবন পদ্ধতির প্রশ্নে আমাদের সংগে ঐকমত্য পোষণ করবে এবং তার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাদেরকে মদদগার হিসেবে পাবার আশা করা যাবে, তেমন লোকদেরকেও আমরা নির্বাচনে পাস করানোর চেষ্টা করবো। কিন্তু যেসব অজুহাতের ভিত্তিতে আমরা এই জিনিসটাকে আলোচ্য কর্মনীতিতে শামিল করে নিয়েছি, আসলে সেগুলো উপলব্ধি করতেই জটিলতা দেখা দেয়। এটাকে বুঝতে হলে যে পরিস্থিতিতে আমাদের এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে, তার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা দরকার।

পরিস্থিতির একটি দিক হলো এই যে, নয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে সারা দেশের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের নয়টিরও অধিক আসনে যুগপৎ নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হবে। বর্তমান সময়ে ঐ আসনগুলোতে কিংবা তার বেশীর ভাগ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ আমাদের কাছে নেই। কেবল এর ব্যয়-ভারের দিকটা চিন্তা করলেই এটা আমাদের পক্ষে কতোবড়ো কঠিন কাজ, তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

দ্বিতীয় দিক হলো এই যে, সারা দেশে জামায়াতের প্রভাব সামান্য নয়। কতিপয় আসনে আমাদের এটুকু শক্তি রয়েছে যে, আমরা সরাসরি নিজস্ব নির্বাচনী পন্থা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রার্থীদের পাস করিয়ে নিতে পারি। কিন্তু বহুতরো আসনেই আমাদের এতোখানি শক্তি নেই বটে, তবে এটুকু শক্তি অবশ্যই আছে যে, ভালো এবং সৎ প্রার্থীর সাফল্যের প্রশ্নে আমাদের সমর্থন এবং অসৎ প্রার্থীদের পরাজয়ের ব্যাপারে আমাদের বিরোধিতা বহুলাংশে প্রভাবশীল হতে পারে। এই ধরনের আসনে নিজেদের শক্তিকে অকেজো করে রাখা এবং তাকে কোনো কাজে না লাগানো মোটেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

তৃতীয় দিক হলো এই যে, আমাদের দেশে জামায়াতে ইসলামীর বাইরেও ধর্মহীনতার বিরোধী ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সমর্থক ব্যক্তি এবং দলের অস্তিত্ব রয়েছে। ধর্মহীন শক্তিগুলোর মুকাবেলায় এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যাতে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে এবং তাদের শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণে ব্যয়িত হয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর জন্যে সহায়ক না হয় তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা পূর্বের ন্যায় আজো আমাদের মধ্যে থাকা উচিত। বিশেষতঃ ভাবী পরিষদসমূহে আমাদের পার্লামেন্টারী পার্টিকে একাকীই যাতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন দান করতে না হয়, বরং এই কাজে তার সহায়তা করার জন্যে বাইরেরও যথেষ্টসংখ্যক লোক সেখানে বর্তমান থাকে, তজ্জন্যে আসন্ন নির্বাচনেও আমাদের এই ঐক্য ও সহযোগিতার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্যেই যেসব আসনে আমরা সরাসরি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করছি না, সেখানে আমাদের শক্তির অপচয় হবার পরিবর্তে কোন ইসলামপন্থী ব্যক্তি বা দলের সপক্ষে ব্যয়িত হোক এটাই আমরা মনে-প্রাণে কামনা করবো। শুধু তাই নয়, যেখানে এ ধরনের কোনো ব্যক্তি বা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে কোনো সৎ এবং উপযুক্ত লোককে দাঁড়ানোর জন্যে আমরা পরামর্শ দেবো এবং নিজেদের সাহায্য-সমর্থন দ্বারা তাকে পাস করিয়ে নেবারও চেষ্টা করবো। এজন্যে শুধু শর্ত থাকবে এই যে, সংশ্লিষ্ট আসনে তার ব্যক্তিগত প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণের থাকতে হবে এবং তার নির্বাচনী প্রচেষ্টার সমস্ত বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপানো যাবে না।

পরিস্থিতির এই তিনটি দিককে সামনে রেখে চিন্তা করলে আলোচ্য প্রস্তাবনায় উল্লিখিত নির্বাচন-নীতিতে প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সংগে পরোক্ষ পদ্ধতির সুযোগ রাখা যে সংগত হয়েছে, এসম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত হতে পারবেন।

বস্তুতঃ এটি ছিলো আমাদের সাবেক কর্মনীতির একটি শূন্যতা। অভিজ্ঞতা এবং পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি যে, একে পূর্ণ করা বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। আমার মতে, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কর্মনীতিতে প্রয়োজনীয় রদবদল না করা পর্যন্ত কোনো দল বা জামায়াত শুধু এ যুগে নয়, কোনো যুগেই জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযোগী হতে পারে না। এই কাজ যদি বাস্তবিকই আপনারা সম্পাদন করতে চান এবং শুধু তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত হতে না চান, তবে খোদা ও রাসূল কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধকেই আপনারা যথেষ্ট মনে করে নিন এবং অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আরোপ থেকে নিজেরা বিরত থাকুন। শরীয়াত কর্মনীতিতে যেটুকু পরিবর্তন সাধনের অনুমতি দেয় এবং বাস্তব প্রয়োজনও যার দাবী করে, আমাদের পূর্বেকার কর্মনীতি তা থেকে স্বতন্ত্র ছিলো বলে এমনিতরো পরিবর্তন থেকে বিরত থাকা একটি অর্থহীন স্থবিরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনি স্থবিরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনারা নীতিনিষ্ঠার ফখর করতে পারেন বটে; কিন্তু আপনাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে এ শুধু অচলায়তনই দাঁড় করিয়ে রাখবে আর এই অচলায়তন দাঁড় করানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃআপনাদের ওপরই বর্তাবে। কারণ আল্লাহ্ এবং রসূল তাকে দাঁড় করাননি।

ব্যাপকতর কর্মনীতির প্রয়োজন ঃ

বস্তুতঃ এই সাধারণ সম্মেলন পরিস্থিতি ও প্রয়োজন মুতাবেক কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ সম্বলিত একটি ব্যাপক ভিত্তিক কর্মনীতি তৈরি করে জামায়াতের হাতে অর্পণ করুক, এটাই হচ্ছে প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য। অতঃপর এই চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে, সময় ও সুযোগ অনুসারে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে বাস্তব কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনারা মজলিসে শূরার ওপর ছেড়ে দিন। আপনাদেরকে চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, জামায়াত এ দেশের নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না, যাতে করে এ সম্পর্কিত যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং জামায়াতের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ করা বা না-করা কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না-করা সম্পর্কে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে এবং যা কর্মীদের চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত করে চলছে, তার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এখন নির্বাচনে আপনারা কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন

বাকী থেকে যায় শুধু এই প্রশ্নটি। এজন্যে আপনারা একটি ব্যাপকতর কর্মনীতি তৈরি করে মজলিসে শূরাকে দিয়ে দিন। কিন্তু এই সাধারণ সম্মেলনেই তার বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করে নিজেদের হাত বেঁধে ফেলবেন না। কারণ, যেসব খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনারা সিদ্ধান্ত করে যাবেন, কখনো তা বদলানোর প্রয়োজন দেখা দিলে আবার এই সাধারণ সম্মেলনই আহ্বান করতে হবে।কিন্তু কথায়-কথায় এতোবড়ো সম্মেলন অনুষ্ঠান করা যে সহজ কাজ নয়, এটাও আপনারা জানেন।

শেষ কথা

সহকর্মী বন্ধুগণ! আমি আমার অভ্যাসের বিরুদ্ধে এবং নিজের সহনশক্তি অতিক্রম করে বর্তমান প্রস্তাবনার ওপর দীর্ঘ ছয় ঘন্টাব্যাপী এই বক্তৃতা প্রদান করলাম। এই জন্যে যে, আপনারা যেনো খুব ভেবে-চিন্তে এবং সকল দিকে লক্ষ্য রেখে কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারেন। এই প্রস্তাবনা আপনাদের আজ পর্যন্তকার সমুদয় কাজ সম্পর্কে একটি ফায়সালা ঘোষণা করছে এবং ভবিষ্যতে যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনাদের কাজ করতে হবে, তাও নির্ধারণ করে দিচ্ছে। কাজেই একে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে, এর প্রত্যেকটি ধারা এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ বিচক্ষণতার সঙ্গে চিন্তা করা আপনাদের কর্তব্য।

এই প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমার এমন বহুতরো খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করতে হয়েছে, স্থুল দৃষ্টিতে যেগুলোকে কেউ অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু আমি বক্তৃতার সূচনায়ই ইংগিত দিয়েছি যে, এই জামায়াতের একটি শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিলো। সেই প্রয়োজনটিই আমি পূরণ করার চেষ্টা করেছি। এই আন্দোলনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায় নিজেরা অতিক্রম করে এসেছেন এবং এর প্রত্যেকটি জিনিসেরই 'শানে-নুযূল' সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত, এমন লোকের সংখ্যা বর্তমানে জামায়াতে খুব কমই রয়েছে। এর বেশীর ভাগ কর্মীই এসেছেন মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোতে এবং প্রথম দিককার পর্যায়গুলো তাঁদের পক্ষে নিছক ঐতিহাসিক বিষয় মাত্র। পরন্তু ভবিষ্যতে এমন আরো অনেক লোক আসবে, যাদের পক্ষে আজকের এইসব কিছুই হবে ইতিহাসের অন্তর্গত। সুতরাং আজ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে কি কি কাজ করেছি এবং কেনই বা করেছি, তা বোঝা তাদের

পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে; বরং প্রকৃতপক্ষে হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং যথেষ্ট বিভ্রান্তিরও কারণে পরিণত হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি শুধু তাদের নিশ্চিন্ততারই ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, নিজেদের স্থায়ী ভবিষ্যতের জন্যে নির্ভুল দিক নির্ণয়েও প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি করছে এবং আগামীতে আরো বেশী সৃষ্টি করবে। এই অসুবিধাগুলো দূর করার ব্যাপারে অন্যান্য কর্মীর চাইতে আমার ওপরই বেশী দায়িত্ব অর্পিত। কারণ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমিই এ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে আসছি এবং এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কারণ ও প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে আমিই ভালোভাবে অবহিত। আমি এইসব কাজ এলোপাতাড়িভাবে সম্পাদন করিনি, বরং রাত-দিনের চিন্তা-ভাবনার পর খুব বুঝে-শুনে এক একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। তাই অতীতের সমস্ত কাজের হিসেব-নিকেশ খোলাখুলিভাবে জামায়াতের সামনে পেশ করার দায়িত্ব আমার কাঁধেই ন্যস্ত ছিলো। কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে বারবার আমার পক্ষে ছয় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করা সম্ভব নয়। আজকে এখানে গোটা জামায়াত উপস্থিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি, যে উদ্দেশ্যে আমি এই মেহনত করেছি তা তিনি পূর্ণ করুন এবং নিশ্চিন্ততা ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করার এবং নিজেদের আন্দোলনকে ভালোমত বোঝবার ব্যাপারে কর্মীদের যে সাহায্যের প্রয়োজন, আমার এই বক্তৃতা থেকে তারা সেই সাহায্য লাভ করুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

জামায়াতে ইসলামীকে জানার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলো পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়
- পরিচিতি- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
- জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
- ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
- জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
- মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন
- গঠনতন্ত্র- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- মেনিফেস্টো- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- সংগঠন পদ্ধতি- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কর্মী ও রুকন)
- অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
- ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন
- সত্যের সাক্ষ্য
- ইকামাতে দীন
- ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
- হেদায়াত
- ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী
- ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহীহ জযবা
- ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
- ইসলামী বিপ্লবের পথ
- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী
- গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
- কার্যবিবরণী- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (১ম ও ২য় খণ্ড)
- জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
- জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় ইতিহাস
- মাওলানা মওদূদী (রহ.)

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯